নৈত্যপুরাণ

আমেনা বেগম ছোটন

ওয়েমার্ক ই-পাবলিকেশন

নিত্যপুরাণ

আমেনা বেগম ছোটন

ওয়েমার্ক ই-পাবলিকেশন

গ্রন্থস্বত্ব © লেখক

ই-বুক প্রকাশ : মার্চ ২০২০

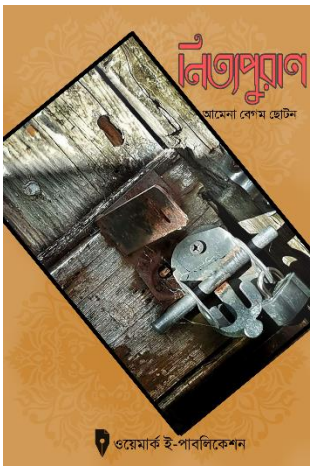

প্রচ্ছদ : হাফিজুর রহমান রিক

প্রচ্ছদ ছবিঃ মুন্নি লাল

ই-বুক কারিগরি : হাফিজুর রহমান রিক

প্রকাশক : ওয়েমার্ক ই-পাবলিকেশন

Email : waymarkepublication@gmail.com

এই ই-বুক শুধুমাত্র পাঠকের বই পড়ার অভ্যেস গড়ার জন্য এবং যে কেউ বিনামূল্যে বিতরণ করতে পারবে । লেখকের অনুমতি ব্যতীত বইটি বিক্রির উদ্দেশ্যে মুদ্রণ এবং যেকোন ওয়েব ও ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে ব্যবহার নিষিদ্ধ । বইয়ের সকল লেখার দায়দায়িত্ব লেখকের ।

উ ৎ স র্গ

যারা আমাকে লেখালেখি চালিয়ে যাবার

উৎসাহ দিয়েছেন।

গল্পসূচি

প্রমাণাদি	৭
অবর্তমানে	৪২
বাড়ি ফেরা	৪৭
পূর্ণিমায়	৫২
অধিকার	৫৯
সংগিনী	৬৫
কাঙালের ধন	৭৭
প্ররোচিত	৮৩
বুদ্ধি	৯২
লেখিকার স্বামী	৯৯
য়াইফোন ৩	১১৯
বিরল পাপী	১২৪
ঠাটবাট	১৩৭
কম্প্রোমাইজ	১৪৪

মুখবন্ধ

ইবুক প্রকাশিত হতে যাচ্ছে এটি আমার জন্য খুবই আনন্দদায়ক একটি ঘটনা। খুশির প্রথম কারণ, এটি পরিবেশ বান্ধব প্রজেক্ট। আমার লেখার মান এমন কিছু না, যার জন্য কিছু গাছ, তার পাতা বিসর্জন এবং কার্বন এমিশন বাড়াতে হবে।

দ্বিতীয় কারণ, অর্থনৈতিক। টাকা পয়সা দিয়ে বই ছাপানোর আগ্রহ আমার নাই। আসলে সেরকম টাকাও নাই। একটা মাঝারি সাইজের বইয়ের খরচ প্রায় ৬০ হাজার টাকা। এই টাকায় ঢাকা সিডনি টিকেট হয়ে যায়।

অবশ্য এই প্রজেক্টে টাকা লাগছে না এটি ভুল কথা। টাইম এন্ড ইন্টিলিজেন্স ইজ এনাদার টাইপ অফ কারেন্সি। যে পরিমাণ সময় এবং পরিশ্রম একেক টা বইয়ের পেছনে দিতে হচ্ছে তাই দিয়ে বিশ ইউরো পার আওয়ার কাজ করা যেত।

শুধু আমার বইটার কথা বলা যাক। পান্ডুলিপি দিতে বলা হলে কপি পেস্ট একটা ফাইল বানাতে সময় নিলাম এক মাস। ডক ফাইলে ভুমিকা উৎসর্গ ইত্যাদি এসব লিখে পাঠানোর পর দেখা গেল সেটি সেভ হয় নি। রিকের আমাকে ১০ বার নক করা লাগল, সে একজন প্রবাসী বিজনেস ম্যান। আমি খুব ভাল করে জানি এত সময় তার নাই। তবুও ধৈর্য্য ধরে চেষ্টা করে গেছে। তার এবং তার টিমের সবার প্রতি সীমাহীন কৃতজ্ঞতা।

এটি কি বিষয়ক বই? মুলত গল্প সংকলন। এর সবই পুর্বে প্রকাশিত। একটা অস্বস্তিকর বিষয় হচ্ছে বইয়ে বিনোদন গল্প খুবই কম। বেশিরভাগ ই কষ্টের। লেখক হিসেবে আমি আনন্দের গল্প লিখতে ব্যর্থ বলা যায়।

আরও অনেক গুলি ই বুক, ওয়েমার্ক থেকে প্রকাশিত হয়েছে। হাফিজুর রহমান নিজে অনেক উচুমানের লেখক, তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস প্রতিটি গল্পের বই ই পাঠকের ভাল লাগবে।

Regards

Amena

প্রমাণাদি

স্লামালিকুম, ভাইসাব।

ওয়ালাইকুম সাগল্প# প্রমাণাদি

স্লামালিকুম, ভাইসাব।

ওয়ালাইকুম সালাম। হান্নান একটু খুশি হয়ে তাকায়। তাকে তেমন কেউ সালাম দেয় না। এ বাড়ির কেয়ারটেকার কাম দারোয়ান সে। আসতে যেতে সেই বরং সকল কে সালাম দেয়। বেশিরভাগ ই খেয়াল করে না, করলেও নিম্নবিত্তের সালাম নিয়ে কেউ উচ্ছসিত হয় না। মাঝেমধ্যে দুয়েকজন ভালভাবে সালামের উত্তর দেয়। তখন বেশ ভাল লাগে তার।

সালামদাতার দিকে তাকাল হান্নান। একজন প্রায় বৃদ্ধা মহিলা, সাধারণ পোষাকে। বেশ পুরোনো টাংগাইল শাড়ি, উপরে বড় সুতি ওড়না। তার ক্লাসের

ই লোক। হান্নানের খুশিভাব স্তিমিত হয়ে আসে। মোটামুটি নিঃস্পৃহ গলায় বলে, কি চান?

এ বাড়িতে উকিল শীরীন রহমান থাকেন না?

হ্যা, থাকেন। কেন?

উনার সাথে একটু দেখা করতে চাই। একটা মামলার ব্যাপার।

উনার এসিস্ট্যান্টের সাথে আলাপ হইছে? এপয়েন্টমেন্ট আছে?

মহিলা একটু বিব্রত হোন,

- না, নাই। আমি অনেক দূর থেকে আসছি। অনেক কষ্টে এই বাড়ির ঠিকানা যোগাড় করছি, আমারে একটু মেহেরবানি করেন। আপ্নে আমার ছেলের মত। মহিলা প্রায় কেঁদে ফেলে।

এবার হান্নান বিব্রত হয়, যন্ত্রণা। শিরীন রহমান অনেক নামকরা উকিল। যে সে তার সাথে যখন তখন দেখা করতে পারে না। তাছাড়া, যখন থেকে সে এই রাজাকার দের বিরুদ্ধে মামলা শুরু করেছে, তখন থেকে কয়েকবার ই উপর হামলার চেষ্টা হয়েছে। কুরিয়ারে কাফনের কাপড়, আগরবাতি পাঠানো, তার গাড়ী তে ককটেল ছোড়া ইত্যাদি যন্ত্রণার শেষ নাই। এই জন্যে সবাইরে তার কাছে পাঠান যায় না, কে কোন মতলবে আসে, বুঝা মুশকিল।

ঝামেলাবাজ মহিলা, জন্মের আগের সময় কোন যুদ্ধ, আর সব বুড়াথুড়া রাজাকার এই নিয়ে আবার দেশে নতুন করে গ্যাঞ্জাম বাধানির দরকার টা কি? যুদ্ধ শেষ, হিসেব ও শেষ। তা না, যত্তসব আজাইরা ঢং।

- ভাই গো।

মহিলার ডাকে হান্নানের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ বাধাগ্রস্ত হয়। এ মহিলা কি চায়, কে জানে?

না, এখন দেখা করা যাবে না। ভরদুপুর ২ টা। এইসময় কেউ কারু সাথে দেখা করতে আসে?

- ভাইডি, আমি ময়মনসিংহর সকালের ট্রেন ধরে আসছি , বাড়ি চিনতাম না। বাস আরেক জায়গায় নিছিল গা, পরে রিক্সাওয়ালা দুই ঘন্টা খুইজা এই ঠিকানা বার করছে। ট্রেন, রিক্সা মিলায়া ৪০০ টাকা শেষ, আর আছে ১৫০ টাকা। সেজন্য ২ টা বাজছে। আমারে দেখা করার ব্যবস্থা করে দেন ভাই, আমার এই শহরে থাকার জায়গা নাই। আবার রাতে ময়মনসিংহ যামু গা।

- ময়মনসিংহে উকিল নাই? এত যন্ত্রণা করে ঢাকা আসছেন কেন? কি মামলা?

- ৭১ এর মামলা ভাই ডি। এক মামলায় আমি সাক্ষি দিতে পারমু, উনারে একটু ভাও কইরা দেন।

হান্নান, মাথা চুলকায়। কি করবে, বুঝতে পারছে না। ধুত্তেরি যন্ত্রণা সব।

আধাঘণ্টা পর মহিলা কে শীরিন রহমানের চেম্বারে বসে থাকতে দেখা যায়।

শীরিন রহমানের জুনিয়র এসিস্ট্যান্ট হাসান একটু উস্খুশ করে। এই মহিলার উদ্দেশ্য বুঝতে পারছে না। সে এখানে এসেছে কাজ শিখতে, টাকাপয়সা তেমন পাওয়া যায় না। ল পাস করল এক বছর আগে, কাজ শিখছে, কবে নিজের পসার হবে, তারপর বিয়ে করতে পারবে, আল্লাহ জানে। একবার প্রেম করেছিল, সেই মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। আরেকবার প্রেম করার চেষ্টা করবে কি না বুঝতে পারছে না। অল্পবয়সী মেয়েদের সাথে মিষ্টি মিষ্টি গল্প করতে ভালই লাগে, তবে

প্রেম মেলা স্ট্রেসের ব্যাপার। নানারকম ভুজং ভাজং দিতে হয়। রেস্টুরেন্ট এ খাওয়াদাওয়া, ফোন বিল, তারপর শুরু করে বিয়ের তাগাদা, ঘ্যানরঘ্যানর অসহ্য। তার বয়স ত্রিশ ছুঁইছুঁই, এসব চ্যাংড়ামি আর পোষায় না। চুল গুলি কেন পরে যাচ্ছে কে জানে? জগতের সকল বস্তুর তার বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে?

- সার, স্লামালিকুম।

ছেদ পরে হাসানের জীবন ভাবনায়। ওয়ালাইকুম সালাম। হান্নান বললো, ৭১ এর মামলার ব্যাপারে এসেছেন, কি ব্যাপার? কার বিরুদ্ধে সাক্ষি দিতে চান?

- সাইফুল তালুকদারের মামলায়।

হাসান একটু নড়েচড়ে বসে। সাইফুল তালুকদার একজন বিগশট। ইসলাম অনুরাগী এবং আলেম হিসেবে তার দেশে বিশেষ খ্যাতি আছে, ভক্ত ও প্রচুর। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তিনি। প্রায় গোটা বিশেক মাদ্রাসা আছে তার। ভাল সুযোগ সুবিধা থাকায়, অনেক অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেরাও এসব মাদ্রাসায় পড়ে। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িয়েছেন, বছর দশেক আগে। নিন্দুকেরা বলে, বিরোধী শিবির দমন পীড়নের জন্যই উনার নামে মামলা দেয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত উনার বিরুদ্ধে পোক্ত কোন সাক্ষী সাবুদ পাওয়া যায় নাই। শোনা ইতিহাস বা ব্লগার দের আবদারে ত ফৌজদারি মামলা চালানো যায় না। আর কয়েক শুনানির পর হয়ত উনাকে বেকসুর খালাস দিয়ে দিতে হবে। এই মহিলা কি সাক্ষী দেবে? কি হয়েছিল?

- আপনি যা জানেন, ডিটেইলস বলেন আমাকে। আমি নোট করে ম্যাডাম কে জানাব।

বৃদ্ধা একটু বিব্রত হয়। আপ্নেরে বলতে পারমু না, স্যার। এট্টু সমস্যা আছে। ম্যাডাম রে বলতে চাই।

হাসানের মেজাজ খারাপ হয়, আমাকে না বলতে পারলে কোর্টে এক ঘর লোকের সামনে বলবেন কি করে? কি কেস? বীরাঙ্গনা? না কি অন্যের শোনা গল্প? যা বলার পরিষ্কার করে বলুন।

মহিলা কুকড়ে যায়। স্যার, আপনি কিছু মনে নিয়েন না। আগে উকিল মেডামের সাথে কথা বলতে চাই। উনি যা কইবেন, তা করমু।

হাসান আরেক ধমক দিতে যাচ্ছিল। এসময় শিরিন চেম্বারে ঢুকে। কি ব্যাপার, হাসান?

- ইনি নাকি সাইফুল তালুকদারের ব্যাপারে সাক্ষী দিতে চান।

- সাক্ষী না ম্যাডাম, মামলা।

- কি মামলা?

- হত্যা, ধর্ষণ।

শিরিন রহমানের ভ্রু কুঁচকে যায়। তালুকদারের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার মত কাউকে পাওয়া যাচ্ছিল না, সে জায়গায় এই মহিলা নিজে মামলা করতে চায়। আশ্চর্য ত।

ঘড়ি দেখল শিরিন। ছেলের স্কুল ছুটি হবে এখন। অপরাধী দের ভয়ে এখন আর কাউকে ভরসা হয় না। নিজেই আনানেওয়া করে ছেলে কে। বাবুই অবশ্য এতে খুব খুশি। মাকে পাওয়া যাচ্ছে। যানজট মিলিয়ে প্রায় ঘন্টাখানেক। আগে প্র্যাক্টিসের কারণে ওভাবে সময় দিতে পারত না।

- ঠিক আছে। আপনি আপনার বক্তব্য গুছিয়ে রাখুন। আমি ছেলেকে স্কুল থেকে নিয়ে এসে সব শুনব। দুপুরে কিছু খেয়েছেন?

- না, ম্যাডাম। একটু পানি দিলেই হবে।

- কোন অসুবিধা নেই। আমি সুফিয়া কে বলে দিচ্ছি। আপনি খেয়ে বিশ্রাম করুন।

সুফিয়া বেশ যত্ন করেই বৃদ্ধা কে খাওয়ায়। বৃদ্ধা শান্ত হয়ে বক্তব্য গুছাতে বসে। কি বলা যায়।

বাকি গল্প এ বৃদ্ধার জবানিতেই শুনব।

সময়কাল ৭১।

২

আমার নাম মালতি রাণী দাস। আমাদের আদিনিবাস মাধবপাশা, বরিশাল । মাদের ১৪ পুরুষের বাস সেখানে, আমরা জাতে বৈষ্ণব হলেও আমাদের ঠাকুর্দা ছিলেন বেশ বিষয়ী মানুষ। আমাদের কয়েক একর জমি ছিল, তাতে চাষবাস হত। হালের গরু, দুধেল গাভী, প্রকান্ড বসতভিটা সবই ছিল। আমাদের কাকারা তিন ভাই, পিসি ছিলেন ৪ জন। আমাদের ঠাম্মা ঠাকুরদা ছিলেন মনি কাঞ্চন যোগ। দুজনের গায়ের রঙ কাচা সোনার মত, চেহারাও তেমনি, ভিনগাঁয়ের লোকে প্রায়ই আমাদের ব্রাহ্মণ বলে ভুল করত। আমাদের কাকু পিসিরাও তাই সেরকম চেহারার। দুই পিসির বিয়ে হয়েছিল কলকাতায়, ছোট কাকুও মেজ পিসির বাড়িতে থেকে পড়তেন।

আমার ঠাম্মা খুব ডাকসাইটে মহিলা ছিলেন। রুপের ঠাট যাতে নষ্ট না হয়, সে জন্য কয়েক জেলা ঘুরে ফিরে আমার মা কাকিদের খুঁজে এনেছিলেন। ছোট বয়সী রা যখন বাড়ির সামনে খেলা করত, আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে গেলে অন্যগ্রামের লোকে জিগেস করত এ কার বাড়ি, সোনার পুতুলের মত ছেলেপিলে সব।

আমার ঠাকুর্দার নাম বৈকুণ্ঠ দাস। তখন গ্রামে তার প্রতিপত্তি ও ছিল অনেক। এখন বুঝি, যদি কারু অনেক টাকাকড়ি থাকে তার প্রতিপত্তি এম্নিতেই হয়ে যায়, এই এখন যেমন সাইফুল তালুকদারের। তখন অবশ্য কেউ জানত না, সাইফুলের পদবী তালুকদার। সে গ্রামে এসেছিল রোগাভোগা অবস্থায়। মাথায় বেতের টুপি, পরনে লুঙ্গী, ফতুয়া। আমাদের গ্রামে মুসলমান ছিল কয়েক ঘর, তাদের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না, জমিজমা অল্প থাকায় তারা আমাদের জমিতে চাষবাস করত। মাঝেমধ্যে ঠাকুরদার কাছে জমি বন্ধক দিয়ে সুদে ধার করত, সময়মত শোধ করতে পারত না বলে তাদের জমিগুলিও ঠাকুরদার অধিকারে চলে আসে। সেই কয়েক ঘর মুসলমান পরিবার সাইফুল কে আশ্রয় দেয়, সাইফুল তাদের ছেলেদের সকালে আলিফ বা তা ছা পড়াত, প্রতি বেলায় কারু উঠানে নামায পড়াত। মসজিদ ছিল প্রায় আরেক গ্রামে। সাইফুল আসাতে এ গ্রামের মুস্লিম রা ধর্মেকর্মে মনোযোগী হয়ে উঠে। আমাদের বারো মাসের তেরো পার্বণের সাথে তারা এই নিয়েই পাল্লা দিত।

আমার বয়স তখন ১৫। আমি পরিষ্কার রঙিন কাপড় পরি। ছোটকাকু, পিসিদের চিঠি লিখতে পারি। আমি বাবার বড় মেয়ে, বিয়ের জন্য গয়না গড়িয়ে রাখে বাবা মা। তা পরেও ঘুরি মাঝেমধ্যে। সন্ধ্যায় তুলসি প্রদীপ জলার পর ঠাম্মা

কে লক্ষীর পাঁচালি শোনাই। ঠাম্মা আমাকে তার বউ জীবনকালের গল্প শোনায়, আমি মনেমনে প্রস্তুত হই, এ বাড়ির পাট চুকিয়ে অন্য বাড়ির রানী হতে। সেখানে নিশ্চয় আরো সুন্দর শাড়ি গয়না আর পানের বাটা, রুপার চাবিছড়া নিয়ে আমার সংসার হবে। শিব, কৃষ্ণর মত স্বামী হবে, আর সোনার পুতুলের মত ছেলেপিলে। তবু মাঝেমধ্যেই আমার মন কেমন করত। পথেঘাটে সাইফুল মাঝেমধ্যেই দেবিদর্শনের ভঙ্গী করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত। আমি মুখ টিপে হাসতাম, পরজন্মে চেষ্টা কর বনমালী। এ জন্ম তোমার বৃথাই যাবে। বামুন হয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়িও না। সে মাঝেমধ্যে আমাদের বাড়িও আসত, তবে সেটা কাচারিঘর পর্যন্তই। আমার বাপ ঠাকুর্দা তাকে ভালই খাতির করতেন। সন্দেশ টা, কলা টা পাঠাতেন। হুজুর পুরোহিত রা সব ধর্মেই সম্মান পায়, অন্য ধর্মের হলেও। অন্তত তখনকার দিনে এটাই রীতি ছিল।

বাংলা ১৩৭৬, অগ্রহায়ণ এ আমার আশীর্বাদ হয়ে যায়। ছোটকাকার এক বন্ধু এসেছিল বেড়াতে কলকাতা থেকে। আমাদের ই স্বজাত। দেখতে তেমন ভাল না হলেও অবস্থাপন্ন ঘর তাদের। এক বাপের এক ছেলে। সে তার মাকে গিয়ে আমার কথা বললে তার মা এসে আমায় আশীর্বাদ করে যায়। তাদের নাকি আদিনিবাস বিক্রমপুর। ৪৭ এ দেশ ছাড়ে, তাই এদেশের প্রতি তাদের আলাদা টান। বরিশালের হিন্দু মেয়েদের রুপগুণের নাম ছিল তখন এপারওপার বাংলায়। আমার বেশ লাগে। কলকাতা দেখব, ঘোড়ার গাড়ি চরব, হাওড়া ব্রিজে উঠব। এই পোড়ার বরিশালে আছে কি? যাত্রা সার্কাস ছাড়া? আসছে শ্রাবণে লগ্ন। বিয়ে হবে কলকাতায়। আমরা সকলে পিসির বাড়ি যাব, সেখানেই কনে সম্প্রদান হবে। আমি সেজন্য প্রস্তুত। আমার হবুবর আমার এক খানা ফটো নিয়ে গেছে। শ্রাবণ

পর্যন্ত তাকে ওই নিয়েই থাকতে হবে, এই ভেবে বেশ লাগত আমার। আমি নিয়ম করে হলুদ চন্দন মেখে স্নান করি। ঠাম্মার আদেশ, এতে নাকি শ্রাবণে রুপ আরো খুলবে। মেজকাকী বিরক্ত হত। মালতীর রুপ কিছু কম নাকি, যে হলুদ মাখাতে হবে ? আমি কিছু বলি না। ঘর কন্না শিখি। শসুরবাড়িতে নয়ত বদনাম হবে, মেয়ে কে শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠায় নি। কলকাত্তাই রা নাকি বেশ নাক উঁচু।

দেশে নাকি কিসের নির্বাচন হয়েছে। শেখসাব নামে কার জানি মন্ত্রী হবার কথা। আমি এসব ভাল বুঝতাম ও না। বাপ ঠাকুরদা রা বিকেলের জলখাবার খেয়ে এসব আলাপ করতেন। এসব আলাপ করাও এক রকম বড়লোকি। এসবের আচ আমাদের তেমন লাগত না। আমার ঠাম্মা গজরগজর করত, ঢাকার লোকেদের মনে হয় খেয়েদেয়ে কাজ নেই, এই দেশ ও তাদের ভাগ করা চাই। ৪৭ এ অত মারামারি কাটাকাটি করেও শখ মিটেনি, নচ্ছার সব।

তবু চৈত্রের মাঝামাঝি ঢাকায় এক বড় হল্লা হয়ে গেল, মিলিটারি নাকি এক রাতে অনেক হাজার লোক মেরে ফেলেছে। আমাদের জ্ঞাতি পরানমাধব কাকা হাপাতে হাপাতে এসে বললেন, দেশে যুদ্ধ লেগে গেছে। হিন্দুদের খুঁজেপেতে মেরে ফেলছে পাকিস্তানি মিলিটারি রা। দ্রুত দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হবে। ছোটকাকাও টেলিগ্রাম করে দিল। আমার ঠাকুর্দা রাজি হলেন না, তার এক কথা ৪৭ থেকে খারাপ কিছু নিশ্চয় হবে না। তখন যখন যান নি, এখনো যাবেন না। যুদ্ধ হচ্ছে শহরে, মিলিটারির আর খেয়ে কাজ নেই, এই গণ্ডগ্রামে আসবে।

আমার বাপ কাকারা বেকে বসলেন। তারা ঝুঁকি নিতে রাজি নন। ঢাকা থেকে ভয়ংকর সব খবর আসে। মেয়েদের নাকি ধরে নিয়ে যায়, এখানে বীরত্ব দেখানো বোকামি। মেজকাকা বেশ ভিতু ছিলেন, একদিন গরুরগাড়ি তে জিনিস পত্র ঠেসে

নিয়ে ঠাকুরদাকে প্রণাম করে বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে বাড়ি ছাড়লেন। ঠাকুরদা সেদিন সারাদিন গুম হয়ে বসে রইলেন। বিকেলে বাবাকে বললেন, সারাজীবন ধরে অত কিছু করলাম, সব ছেড়ে কাংগালের মত পথে নামব? বাবা তার হাত ধরে বললেন, চলুন বাবা। দলিলপত্র আমাদের কাছেই আছে। যুদ্ধ শেষ হলে আবার সব ফিরে পাব।

চৌদ্দপুরুষের সংসারের পাট গুছিয়ে ফেলা অত সহজ না। তবু আমরা তৈরি হতে লাগলাম। বড়পিসি রাও যাবে আমাদের সাথে। জোষ্ঠ্যের তিন তারিখ বাড়ি ছাড়ব এই সিদ্ধান্ত হল। মা আর আমি তোরংগ গুছাতে গিয়ে কেঁদে একসা হলাম। কত কি শখের জিনিস আমাদের, রুপার থালা, কাসার হাড়ি, কতরকম শাড়ি কাপড়, সব ফেলে যেতে হচ্ছে। কলকাতায় এসব পাওয়া যাবে?

তারপর দিন ই সকালে দেখা গেল, বাড়িতে কাদের যেন হাকডাক। আমি গিয়েছিলাম পুকুরে স্নান করতে। পুকুর ঘাট পেরিয়ে পাকঘরের পেছন আসতে গিয়ে দেখি জোবেদ চাচা। আমি আশ্বস্ত হলাম, যাক ভয়ের কিছু নেই। এগুতে গিয়ে দেখি মিলিটারি দাঁড়িয়ে আছে জনা সাতেক। হাতে কেমন অদ্ভুত বন্দুক। মাথায় আবার ভোজালির মত ছুরি লাগানো। আমি আর এগুলাম না। পাকঘরের পাশে পাঠকাঠি,লাকড়ি রাখার জায়গায় জড়সড় হয়ে বসে রইলাম। জোবেদ চাচার সাথে সাইফুল ও আছে। তাদের হাসিহাসি মুখ দেখে বুঝলাম মিলিটারির সাথে তাদের ভালই খাতির হয়েছে। সাইফুল কি এক অদ্ভুত ভাষায় তাদের সাথে কথা বলছিল। মিলিটারি এক ধমক দিতেই জোবেদ চাচার সাথে আসা আরো কিছু লোক বাড়ির ভেতর ছুটে গেল। কিছুক্ষণ পর, ঠাম্মা, মা, আমার ছোট বোন শেফালী আর ভাই নিঝু কে এনে দাঁড় করাল। বাবা আর ঠাকুর্দাকেও নিয়ে আসা

হল। জোবেদ চাচা আর মিলিটারি দের মধ্যে কি যেন কথা হল, মা আর শেফালী কে এক ঘরে নিয়ে বাধা হল। নিঝু, ঠাকুরদা আর বাবাকে সবাই মিলে শুইয়ে ফেল্ল, সাইফুল দৌড়ে এল পাকঘরে। বটি টা হাতে নিয়ে ঘুরতেই আমি তার চোখে পরে গেলাম, আমি ভয়ে কাঁপছিলাম। সাইফুল আমার দিকে তাকিয়ে অভয়ের হাসি হেসে বললো, চুপ করে থাক। ভয় নেই। আমি কিছু বলার আগেই সে বাবার কাছে ছুটে গেল। জোবেদ চাচা কে বটি টা দিয়ে বললো, এই সুদখোর কাফের টারে আল্লাহর নামে কোরবানি দেন। আপনার জমি সব নিছে এই বুইড়া। ঠাকুরদা অবাক হয়ে জোবেদ আলিকে কিছু বলার চেষ্টা করতেই জোবেদ চাচা বটি চালিয়ে দিল। নিঝু, দাদা বলে চিৎকার করতেই সেই অদ্ভুত ছুড়িওয়ালা বন্দুক তার বুকে আমুল বসিয়ে দিল এক মিলিটারি। এরপর বাবার দিকে এগুলো সাইফুল, আমি জ্ঞান হারালাম। সম্ভবত, সেইদিনে এটুকু দয়াই ভগবান আমাকে করেছিলেন।

৩

আমার জ্ঞান ফিরল দুপুরের পর, প্রচন্ড দুর্গন্ধে। আমাদের বাড়ির পায়খানার পাশে একটা খাড়ির মত ছিল , সেখানেই গিয়ে সব মলমুত্র সব জমা হয়। সেই খাড়ির ধারে আমি পরে আছি। ধরমড় করে উঠতে গিয়ে দেখি, আমার হাত পা বাধা। হাত পা বাধল কে, সে কথা ভেবে ঘাড় ঘুরাতে গিয়ে দেখি, ওই পাশে সাইফুল বসে আছে। মুহুর্তের মধ্যে আমার সব মনে পরে গেল, মুর্তিমান শয়তান টা আমার ভাই আর ঠাকুর্দাকে, বাবাকে, রাগে আমার চোখ মুখ জালা করতে

লাগল। খাড়ির মলমুত্রের গন্ধ থেকেও এই মানুষ রুপি জন্তু টাকে আমার বেশি ঘৃণা হচ্ছিল। তার চোখেমুখে তৃপ্তির আভা, আরেক দেশের মিলিটারির সাথে মিলে নিজের দেশের মানুষ হত্যায় এত আনন্দ? তুই বছরখানেক আছিস এ গ্রামে। জোবেদ চাচা আর বাবা ত সমবয়সী, বন্ধুর মতই ছিল। আজ বেশ বটি চালিয়ে দিল, থুতু জমে গেল মুখে।

- ভাল আছ, মালতি?

- আমার বাপ মা, শেফালি ওরা কই?

- শেফালী বেচে আছে। তাকে ক্যাম্পে নিয়ে গেছে। ক্যাপ্টেন সাব একটু কচি মেয়েছেলে পছন্দ করেন।

শেফালির বয়স ৯। আমার গা কাঁপতে লাগল তাকেও এরা, ছেলে হলেই ভাল হত, নিঝুর মত একবারে শেষ হয়ে যেত।

- বাকিরা?

- ওই যে, খাড়ির ভেতর। দেখবা? হাত পা খুলে দেই, দেখ।

পশু টা আমার হাত পায়ের বাধন খুলে দিল। আমি দ্রুত দাঁড়াতে গিয়ে মাথা ঘুরে পরে যাচ্ছিলাম। সাইফুল ধরে ফেল্ল তখন। আমি তাকিয়ে দেখলাম, মলমুত্র আর রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে বাবা, ঠাকুরদা, নিঝু। ঠাম্মা আর মাকে দেখে বুঝলাম, কিছু পুরুষ হত্যার আগে তাদের জৈবিক ক্ষুদাও নিবারণ করে নিয়েছে। ৬০ বছরের বৃদ্ধা বা, ৯ বছরের শিশু- মেয়ে মানেই ওইসব। আমি খাড়ির মলমুত্র, রক্তে ঝাপ দিতে গেলাম। ওদের ওখান থেকে তুলতে হবে। আমাদের বাড়ির লোক চিরকাল ধোপায় কাচা কাপড় পরেছে, প্রতিদিন পরিপাটি ঘর

বিছানায় থেকেছে, তারা এমন নোংরায় কিভাবে থাকবে। সাইফুল আমার হাত টেনে ধরল। ছাড় শুয়োরের বাচ্চা, বলতেই সে আমার মুখ চেপে ধরল। কানেকানে বললো, আমি কাউকে বলি নাই তুমি বেচে আছ। তোমার মা ওদের বলে গেছে, তুমি তোমার মেজচাচার সাথে ইন্ডিয়া গেছ গা, এখন যদি সবাই টের পায়, তোমার হাল ও বাকি হিন্দু মেয়েদের মত হবে। গণিমতের মাল হিসেবে কাফের মেয়েদের ভোগ করবে মুসলমান যোদ্ধা রা। আমার কথামত চললে তোমাকে ওই শেয়াল শকুনের পালে ছাইড়া দিব না। কি? শুনবা আমার কথা?

আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম, আমাকে এখন এই জন্তুটার সাথে আপোষ করতে হবে? অথচ এক মুহূর্ত আগে আমি ভাবছিলাম, আমার সব গেছে, হারাবার কিছু নেই। এখন, আমি এই লাশগুলির জন্য এই পিশাচ টার কথা শুনব। মৃত হতে পারে, তবু এরাই আমার পরিবার। হঠাত, আমার মাথা টা একেবারে শুন্য হয়ে গেল। দু:খ, শোক, কান্না এসব আর আমার দ্বারা হবে না। শান্ত গলায় বললাম, কি চাও?

- তোমার বুদ্ধি ভাল। যাক গা, আমরা তোমাদের বাড়িঘর খোঁজাখুঁজি করেছি, যে যা পারছে নিয়ে গেছে। তবে টাকাপয়সা, সোনাদানা গুলি পাই নাই। ওই গুলি কই রাখছে? ওই গুলা আমারে দিবা। এই হইল প্রথম শর্ত। সাইফুল দম নেয়। কি রাজি?

- বিনিময়ে আমি কি পাব? আমারে ইন্ডিয়া যাইতে দিবা?

হো হো করে হেসে ফেলে সাইফুল। তোমারে ইন্ডিয়া পাঠাইতে বাচায়া রাখি নাই গো লাইলি। তোমার উপর বিশেষ মহব্বত আছে, অনেকদিন ধইরাই। তুমি আমার ঘরে থাকবা। আমার সংগে ইশক মহব্বত করবা, আমার দিলখুশ রাখবা।

অনেকদিন এই অঞ্চলে একা আছি, পুরুষ মানুষের একা থাকা ঠিক না। নানান অধর্ম করতে মন চায়।

- তুমি না হুজুর? আযান দাও, নামায পর? এই তোমার ধর্ম?

- আমার ধর্মে এইসব জায়েজ আছে গো পেয়ারি। কাফের দের যুদ্ধে পরাজিত মহিলা রা দাসী। তারা আমাদের সেবা করতে পারে।

তুমি বিনিময় চাইছিলা না? তোমারে এই যুদ্ধে আমি বাচায় রাখমু। মিলিটারির হাতে দিমু না। মিলিটারি রা কি করে জান নি? সহবাসের পর *** বেয়নেট ঢুকায় দেয়। কারু পাছায় আন্ডা ভইরা দেয়। একজনের উপর আটদশজন মিল্ল্যা - আর তোমার মত সুন্দরি ত সব জায়গায় মিলে না। পাইলে চাবাইয়া খায়া ফালাইব। সাইফুল হাসিমুখে আরো কুৎসিত সব গল্প বলতে থাকে।

অখন বল টেকাটুকা কই রাখছে তোমার ঠাকুর্দা?

- রাধামাধবের আসনের নিচে।

- ঠিক আছে, চল, দেখাই দাও।

- আগে আমার বাপ, মা।

- কি চাও?

- উনাদের দাহ করতে।

- সম্ভব না। তোমাদের ধর্ম ভেজাইল্যা। এখন লাকড়ি মাকড়ি দিয়া লাস পুড়াইতে গেলে সবে দেখব, তখন তোমারে আর বাঁচাইতে পারমু না। গর্ত খুইড়া, সেখানে ফালায়া একটু আগুন দেও মুখে।

তার আগে টাকার জায়গা দেখাও। পরে এইসব তামাসা কইর।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। ঠাম্মার ঘরে ছিল রাধামাধবের আসন। গিয়ে দেখি সেগুলি ভেংগে চুরমার করা। প্রচণ্ড আক্রোশ ছিল তাদের রাধামাধবের উপর। আসন সরালাম, তার নিচে একটা ছোট গর্ত, উপরে শুকনাপাতা দেয়া, তাতে সাদা কাপড়ে বাধা পুটুলি। সাইফুল কে সেটা দিয়ে বললাম, এই নাও।

সংগে সংগে খুলে দেখল সে। প্রায় ৭০ ভরি গয়না, আর হাজার বিশেকের মত টাকা ছিল। আর আমাদের জমিজিরাতের দলিল, খুশিতে দাত বের হয়ে গেল তার, বাকি জীবন বসে খাওয়ার মত ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে তার। পুটুলি বেধে নিয়ে বললো, যাও, লাশ সতকার কর। আমি পাহারায় আছি।

খাড়ি থেকে লাশ টেনে তুলতে নামলাম। আমার বাপ ঠাকুর্দা রা দীর্ঘদেহী মানুষ ছিলেন। আমার একার পক্ষে উনাদের টেনে উঠানো দুঃসাধ্য। তবু, টানাটানি করতে লাগলাম, এক দেড় ফুট ও উঠল না। সাইফুলের মনে হয়ত দয়া হল অথবা টাকা পাওয়ার খুশিতে, সে এক গাছা দড়ি এনে লাশে বেধে টেনে উঠাল, তার ও ঘাম ছুটে যাচ্ছিল। বিড়বিড় করে কি জানি বলছিল। আমি নিঝু আর ঠাম্মা কে উঠালাম। বাড়ির কুয়া থেকে পানি এনে তাদের গায়ে ঢাল্লাম। তবু পুরো টা পরিষ্কার হল না। তখন প্রায় সন্ধ্যা। ভেতর বাড়ি থেকে দুটা পরিষ্কার কাপড় আনতে গিয়ে দেখি, বেশিরভাগ ই লুট হয়ে গেছে। তাও দুটো পুরোনো ধুতি পেলাম। চন্দনে, সিদুরের কৌটা মাটিতে গড়াচ্ছিল, সেও কুড়িয়ে নিয়ে এলাম। সাইফুল তাড়া দিল, এত ঢংগের সময় নাই, রাত হয়ে যাচ্ছে। গজর গজর করতে গর্ত খুড়ল সে। সবাইকে পুরো পরিষ্কার করতে পারলাম না, গা মুছিয়ে চন্দন ফোটা দিলাম। পাকের ঘর থেকে লাকড়ি আনলাম, সাইফুল কে বললাম, একটু আগুন দাও। সাইফুল ম্যাচ দিল একটা।

আমি সবার মুখাগ্নি করলাম। ঠাকুরদা বড় নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাদের সবার ই পুত্র আছে, মুখাগ্নির চিন্তা নাই। আমার করা মুখাগ্নির আশা তাদের ছিল না। সাইফুল সবাইকে এক গর্তে ভরে দ্রুত মাটি চাপা দিতে লাগল, আমি চুপচাপ দেখতে লাগলাম। জীবনে এই প্রথম মৃত্যু দেখা, তাও সমস্ত আপনজনের। অপঘাতে মৃত্যুর জন্য কি যেন সব বিধান আছে, জানিও না। জেনে নেব, তার ও উপায় নেই। সব হিন্দুকে হয় মেরে ফেলেছে নয়ত তারা ইন্ডিয়া চলে গেছে।

সাইফুল ঘাম মুছে আমাকে বললো, আমার বাড়ি চল। এখানে থাকলে সবাই টের পায়া যাবে। বাড়িতে তোমার ব্যবহারের মত কিছু থাকলে নিয়া নাও। তোমাদের বাড়ি এখন মিলিটারি ক্যাম্প হবে।

হঠাত গোয়ালের দিকে তাকিয়ে মনে হল, আমাদের দুই জোড়া বলদ আর গাই বাছুর ছিল, আমাদের সন্তানের মতই আদর করত তাদের বাড়ির সবাই। ওদের মনে হয় নিয়ে গেছে। সাইফুল আমার দৃষ্টি পড়তে পেরেই বলে উঠল, অনেক দিন পর গ্রামে গরু জবেহ হল। তোমাদের এই হিন্দু গ্রামে অনেক দিন গরুর মাংস খাওয়া হয় নাই। আজ হবে।। বিরিয়ানি পাকানো হবে। সাইফুলের আনন্দ আর ধরে না। আজ তার বড় সুখের দিন।

৪

সন্ধ্যাবেলায় মালতি সাইফুলের ঘরে চলে এল। এরপর যা হল, তা অবশ্যম্ভাবী ছিল। সে নিজেকে বাঁচাতে খুব চেষ্টাও করল না। মান সম্মান, সতীত্ব, জীবন ইত্যাদি এসব বাচানোর তাড়া আর ছিল না। তবে খুব ভয় করছিল, ভয়ে মা কে

ডেকেছিল একবার,সেই শুনে কেন জানি সাইফুলের উৎসাহ আরো বেড়ে যাচ্ছিল। এক সময় সে মালতিকে ছেড়ে দেয়। হাপাতে হাপাতে কে জানায়, আমি কত সৌভাগ্যবতী। ক্যাম্পের মেয়েরা অত সহজে রেহাই পায় না। তারপর মালতির হাত গামছায় বেধে ঘুমিয়ে পরে সাইফুল , কি জানি যদি পালিয়ে যায় । বড় অশুচি লাগছিল মালতির নিজেকে, যদি এক গলা জলে সারারাত ডুবে থাকতে পারত, কিছুটা ভাল লাগত।

অন্ধকার ঘরে হাটু মুড়ে বসে শেফালির কথা বড্ড মনে হয়, মেয়েটা অনেক ছোট। খুব ভয় পাচ্ছে নিশ্চয়ই, ব্যথাও, মালতির ই অনেক কষ্ট হচ্ছিল । এই সেদিন শেফালির জন্ম হল। মালতির বয়স তখন ৭। খুব করে কোলে নিতে চাইত, জীবন্ত পুতুল ছিল একটা। কেমন অবাক হয়ে সব দেখত, মা কোলে নিতে দিত না, বলত, ফেলে দিবি, শেফালি ব্যথা পাবে। এখন সে অনেক ব্যথা পাচ্ছে হয়ত, কিন্তু আগলে রাখার জন্য মা, দিদি কেউ নেই। নিঝু টা বড় ন্যাওটা ছিল দিদির । আশীর্বাদের পর কেবল ঘুরে ঘুরে এসে বলত, দিদি, তুই কলকাতা চলে যাবি? সে ত অনেক দূর। আমাদের জন্য তোর মন কেমন করবে না? বলতাম, আমি তোকে নিয়ে যাব, অনেক ভাল স্কুলে ভর্তি করে দেব, ইংরেজি তে কথা বলতে পারবি। নিঝু খুশিতে মাথা নাড়ত।

হ্যা, এখন মন কেমন করছে, সবার জন্য। নিঝু রা সব একদিনে অনেক দূর চলে গেল।

মেজকাকা রা কল্কতা পৌছাতে পেরেছে কি না, কে জানে। হে ভগবান, তাদের পৌছে দিও ঠিকমত। ভগবানের কথা ভাবতে কেমন হাসি পাচ্ছে। বাড়ির সবাই কত পুজো আচ্চা, ভোগ ভুজ্যি দিল ভগবান কে। কই, সে ত আজ তাদের বাঁচাতে

এল না। অথচ ঠাকুরদা সবসময় বলত, এই যে তাদের এত বাড় বাড়ন্ত, সব নাকি ভগবানের কৃপা। আজ বিপদের দিনে কই গেছে কে জানে? আচ্ছা, ভগবান বলে কিছু আছে ত, নাকি নেই?

হঠাত খিদে পেল মালতির, আজ সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত এক গ্লাস জল ও খায় নি সে। তেষ্টা পাচ্ছে অনেক। সাইফুল কে বলবে, একটু জল দিতে? হঠাত তার বটি নিয়ে ছুটে যাবার দৃশ্য টা চোখে ভেসে উঠল। এর হাতে জল খাবে সে? রাম রাম।

সে রাতে রাজ্যের সব ভাবনা ভেবে ফেল্ল মালতি। সাইফুল দুয়েকবার ঘুমের ঘোরে গোংগালো। একবার লাফ দিয়ে উঠে বসে মালতি কে দেখে কে কে বলে চেঁচিয়ে উঠল, আশ্চর্য ভীতু লোক। অথচ সকালে দিব্বি মানুষের গলা কাটল। এই যুদ্ধ কি কোনদিন শেষ হবে? সাইফুল দের কি বিচার হবে? কি বিচার হবে? জেল ফাসি? এই টুকুন মাত্র? সেই বা কে দেবে? ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধই বা করবে কে? আমাদের দেশের লোক চাষবাস করে খাওয়া মানুষ, খুব বেশি হলে লাঠি বর্শা চালাতে পারে। ওই দিয়ে কি যুদ্ধ হবে?

ধীরেধীরে ভোর হল, সাইফুল ঘুম ভেংগে উঠে দরজা খুলে বাইরে গিয়ে কি যেন দেখল, এর পর আমাকে বললো, আমি গোসলে যাই, আযান দিব, নামায পরব। তুমি থাক। এই বলে তালা লাগিয়ে বের হয়ে গেল।

আমার বেশ স্বস্তি হল, এই জানোয়ার টার সাথে এক ঘরে থাকতে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। ঘন্টাখানেক পর এসে আমার বাধন খুলে দিল। চাল ডাল মিলিয়ে ঘ্যাট তরকারি রান্না করল, নিজে খেয়ে পরে বললো, খেয়ে নিও। আমি খাবার নষ্ট পছন্দ করি না।

এভাবে একটা একটা করে দিন কাটতে লাগল। সাত দিনের দিন, সাইফুল খুব মন খারাপ করে ঘরে ফিরল। আমার বেশ অবাক লাগল, সারাদিন খুন খারাপি, লুটতরাজ ই যার জীবনের লক্ষ্য তার আবার মন খারাপ ক হয় কিভাবে? কিছু জিগেস করলাম না, দমবন্ধ করে তার খিদে মেটানোর অপেক্ষায় বসে রইলাম। সে রাতে তার সে ব্যাপারেও উৎসাহ দেখলাম না। আমাকে শুয়ে পরতে বলে নিজেও শুয়ে পরল। রাতে ঘুমের মধ্যে, তুই আমারে মাফ করে দে শেফালি বলে চিৎকার করে জেগে উঠল।

শেফালির নাম শুনে আমিও চমকে গেলাম, দ্রুত কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি হইছে শেফালির? এই, কি হইছে ওর?

সাইফুল খুব অসহায় ভঙ্গী তে আমাকে বললো, শেফালি আজ মারা গেছে।

- ও, আচ্ছা। মনে মনে ভাবলাম, এত হতই। আজ আর কাল। মুখে বললাম, তুমি কান্দ কেন? তুমিই ত দিলা ওরে মরণের হাতে।

- ক্যাপ্টেন সাব অনেক বড় সর মানুষ আছিল। শেফালি তারে নিতে পারে নাই। প্রচুর নাকি রক্তপাত হইতেছিল। তবুও এই কয়দিন ক্যাপ্টেন সাবে তারে ছাড়ে নাই। পরে আজ তার জর হইছিল প্রচুর, রক্তপাতের সাথে পুজ যাইতেছিল, গন্ধে টেকা যাইতেছিল না। আর বাচার আশা নাই দেইখা ক্যাপ্টেন তারে সিপাহী দের হাতে তুইলা দেয়। আমারেই বলছিল, ওরে ওদের তাবু তে দিয়া আসতে। ওরে কোলে নিয়া দিয়া আসার সময় ও আমার গলা ধইরা বললো, সাইফুল কাকা, আমারে দিদির ধারে দিয়া আস, এরা আমারে খুব কষ্ট দেয়। কেমনে দিতাম, বল? পেছন থেকে ক্যাপ্টেন সাব কি জানি কইল, আর সৈনিক রা শেফালি রে আমার থেকে ছিনায়া নিয়া গেল। তাবুতে সবাই মিল্যা ওরে, বেচারির আর

চিল্লানির ও শক্তি ছিল না। কতক্ষণ পর একজন বাইর হয়া বিরক্তমুখে বললো, বাচ্চি মর গায়ি, উসকো ফেক দাও। ইয়ে বাংগালি আওরৎ ভি, ইতনি কমজোর, দোদিন কি কাম কি নেহি।

আমি আর জোবেদ আলি মিল্যা ওরে মাটি দিলাম। ওরা সৈনিক, ওদের দিলে দয়ামায়া নাই গো।

সাইফুল আর কি যেন বলেছিল, আমার মনে নাই, আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।

পরদিন জ্ঞান ফিরে দেখলাম, আবারো হাত বাধা অবস্থায় পরে আছি। সাইফুল নেই। বিবেকের আছর একরাতের বেশি স্থায়ী হয় নেই। আজ আবারো কোন বৈকুণ্ঠ পরিবার শেষ করতে হবে, তাদের বাড়ির মালতী শেফালি দের মুসলমান পাকিস্তানি দের ভোগ ভুজ্যিতে লাগাতে হবে।

৫

শেফালীর মৃত্যুর পর, আমি একেবারে অনুভুতিশুন্য হয়ে গেলাম। আমার মা বাপ নাই, ভাইবোন নাই, সমাজ নাই, ভুত ভবিষ্যৎ বলেও কিছু নাই। আর আছে কি জীবনে? সাইফুল কে।হু বললাম, হাত পা বাধার দরকার নাই। আমি কোথাও পালাব না। সাইফুল ও মোটামুটি নিশ্চিন্ত, আমার সাথে রসের আলাপ করার চেষ্টা করে, বলে সে নাকি আমাদের কৃষ্ণর মত,তার নাকি কাজই ছিল মেয়েদের ফষ্টিনষ্টি করা। আমার প্রতিবাদ করার রুচি হত না। বলুক যা খুশি। মাঝেমধ্যে সারাদিন কি করে সেসব গল্প করত। তার ধারণা, সে খুব ভাল কাজ করে।

কোন হিন্দু বাড়ি পেলে তাদের বলে কলেমা পরে মুসলমান হয়ে যেতে, তাহলে জানে মারবে না। রাজি না হলে তাদের মুল্যবান জিনিসপত্র ছিনিয়ে নিয়ে, গরুছাগল নিয়ে তাদের ইন্ডিয়া পালাতে দেয়, সুন্দরি মেয়ে থাকলে অবশ্য দুয়েক জন ধরে আনতে হয়, নাইলে পাকিস্তানি দের মাথা ঠান্ডা রাখা মুশকিল। মাথায় মেয়েমানুষের নেশা উঠলে শেষে পুরা গ্রাম জালায় দিবে।

বুঝলা পিয়ারি, একজন মহিলার বিনিময়ে যদি পুরা পরিবার আর প্রতিবেশী বাচে, সেটা ত ভালই, কি বল?

আমি মাথা নাড়ি। বেচে থাকা টা অনেক বড় ব্যাপার। আমার বিনিময়ে যদি বাবা, মা, নিঝু বেচে যেত। মাঝেমধ্যে সে আমাকে ধর্ম, রাজনীতি এসব ও বুঝাতে চেষ্টা করে। হিন্দুস্তান হিন্দুদের, পাকিস্তান মুসলমান দের। যে যার দেশে থাকাই ভাল। তোমরা গরু রে মা ডাক, আমাদের বড় অসুবিধা। আমাদের ত আল্লাহর বিধান মানা লাগবে, গরু জবা দিতে হয়।

মাঝেমাঝে আমাকে জিগেস করে আমি মুসলমান হতে চাই কি না। তাদের নবী নাকি এমন করত, যুদ্ধে জিতলে সে গোত্রের একজন রে বিবাহ করত আর তাদের সবাই ইসলাম গ্রহণ করত। তারপর সব ভাইভাই। ইসলাম ধর্ম মহান।

আমি মাথা নাড়তাম, এসব মাথায় ঢুকত না, বড় জটিল ব্যাপার। আমি সমাজচ্যুতা। আমার ধর্মই কি আর ইসলাম ই কি। বাপ ভাই রে খুন করে বাকিদের ভাই ভাই ডাকলেই কি সব মিটে যায়? কি জানি, সে যুগে হয়ত এমন হত।

মাঝেমধ্যে খুব রাগ করে বলত, মুক্তিযোদ্ধা দের কথা। সে অবশ্য বলত, ইন্ডিয়ার বানানো গাদ্দার। গাদ্দার মানে আমি জানতাম না, সে বুঝানির পর বুঝলাম

এর মানে বিশ্বাসঘাতক। এই বিশ্বাসঘাতক রা আসার পর সাইফুলের আরাম প্রায় শেষ। আগে ত ছিল, আমাদের মত গৃহস্তবাড়িতে ঢুকে লুটপাট আর খুনখারাবি, মেয়েদের ধরে নিয়ে যাওয়া। এখন এই মুক্তিযোদ্ধা বা ইন্ডিয়ার গাদ্দার গুলি নাকি পালটা গুলি করে। বোম মারে, গ্রেনেড নামের বোম। ক্যাপ্টেন রা প্রায়ই তাদের ভয়ে চিন্তিত থাকে আর সাইফুল দের ধমকাধমকি করে, মুক্তির খোজ আনার জন্যে। সাইফুল দের জন্য ভাল বিপদ। এই চাষাভুষা, মাঝিমাল্লা কে কোনদিকে মুক্তি হয়ে বসে আছে সে কেমনে জানবে? সন্দেহের বসে তাই, একটু শক্তসমর্থ পুরুষ মানুষ দেখলেই তাদের ধরিয়ে দেয়। মুক্তি হবার আগেই মরে যাক। তার কাজকাম এখন বেড়েছে আগের চেয়ে। মুক্তির ভয়ে সে রাতে ঘুমাতেও পারে না। শুনেছে রাজাকার দের উপরে মুক্তিদের অনেক রাগ। আচ্ছা, রাজাকার দের কি দোষ? সকলের ই ত জানের মায়া আছে, নাকি? মুসল্মানের পাকিস্তান ভেংগে হিন্দুদের গোলামী করা কোন বিবেকবান মুসলমানের পক্ষে সমর্থন করা সম্ভব? এই দেশের কোন দিন ভাল হবে না।

এর মধ্যে একদিন আমার মাথা ঘুরে, বমি হয়ে গেল। খেতে পারছি না। কিছুদিন পর নিজেই বুঝলাম মা হতে যাচ্ছি। সাইফুলের সন্তানের মা, নিজের উপর ঘৃণায় আমার বমি এসে যাচ্ছিল। খুব অসহায় ও লাগল। আমাদের গ্রামে মেয়েরা গর্ভবতী হলে মা, শাশুড়ি, মাসিপিসি রা কত কি বলে, কত আচারবিধি। আমি তার কিছুই জানি না। থাক, জানতে হবে না। এই পাপ গর্ভেই মরুক।

তবু একদিন সাইফুল জিগেস করল কি হয়েছে, বললাম গর্ভে সন্তান। তার চোখমুখ অন্ধকার হয়ে গেল। জিগেস করল গর্ভপাত করাতে চাই কি না? রাজি হয়ে গেলাম। তবে সে ব্যবস্থাও হল না। গংগাদাই নামে যে বুড়ি এই কাজ করতে

পারত, তাকে হিন্দু বলে মেরে ফেলা হয়েছে। সাইফুল নানান ঝামেলায় এ দিকে খেয়াল দিতে পারল না।

কার্তিকের মাঝামাঝি, মুক্তিবাহিনির হাতে তিন জন পাকিস্তানি আর জোবেদ আলি মারা গেল। বাকিরা প্রাণ নিয়ে পালাল। সাইফুল কোন রকমে পালিয়ে বাড়ি এসে তার লুট করা টাকাপয়সা, গয়নাগাটি, জমিজমার দলিল নিয়ে পালিয়ে গেল। আমার হাতে ১০০ টাকা দিয়ে বললো, ইন্ডিয়া পালাতে। আর বাচ্চা হলে আমি যাতে চট্টগ্রামের এক মাদ্রাসায় দিয়ে আসি। সেটা একটা এতিমখানা যেখানে সাইফুল ও ছিল।

আমি সেই ১০০ টাকা হাতে গ্রামের বাইরে বেরিয়ে এলাম। গ্রামে আনন্দের চিৎকার, এই গ্রাম এখন স্বাধীন। আমি পায়ে পায়ে আমাদের বাড়ির দিকে এগুলাম। বাড়ি টা এখন আর চেনা যায় না। পাকাঘর গুলি খালি পরে আছে। এখানেই মনে হয় পাকিস্তানি রা থাকত। কাধে বন্দুক ওয়ালা কিছু ছেলে একটা ঘরের দরজার তালা খুল্ল, খুলে দৌড়ে বের হয়ে এল। তাদের চোখমুখ আতংকে ভরা। আমার কাছে এসে বললো, আপনি কে? আপনার কাছে কিছু কাপড় হবে?

ওই ঘর থেকে মেয়েদের কান্নার আওয়াজ পাওয়া গেল। আমি কাছে গিয়ে দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। শুকনো কংকালসার অনেক গুলি মেয়ে, নোংরা, অপরিষ্কার, বিশ্রী আঁশটে গন্ধ ঘরটায়। তাদের গায়ে নতুন পুরাতন নানারকম ক্ষত, মাথার চুলে জট পাকিয়ে আছে। গায়ে তেমন কাপড় নেই, একজন আমাকে দেখে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে বললো, তুই মালতি না? কই ছিলি তুই? তোকে কেন ছেড়ে দিছে? কোন নাগর তোরে বাচাইছে? বল, হারামজাদি ছিনাল, খানকি, মাগি। বলে ক্রমাগত গালি দিয়ে যেতে লাগল?

গলার স্বর শুনে বুঝলাম, এ বিধুকাকার ছেলের অনিলের বউ। কংকালসার দেহ আর জটপাকানো চুল দেখে চিনতেই পারি নি। তুষখালির মেয়ে ছিল, আমরা সারাগ্রাম মিলে দেখতে গেছিলাম, এত সুন্দর বউ গ্রামে আর কারু বাড়িতে ছিল না। অনিলের বউ আমাকে গাল পাড়তে লাগল। আমি সবাই কে বুঝিয়ে বলতে চাইলাম, কিন্তু সবাই কেন জানি না, আমাকে সাইফুলের রক্ষিতা বলতে লাগল। মুক্তিবাহিনীর ছেলে গুলি ওর কথাই বিশ্বাস করে আমার দিকে বন্দুক তাক করে বললো, বল সাইফুল কোথায়?

আমি হতবাক হয়ে গেলাম। পরিস্থিতি এমন, ওদের কথাই সত্য হয়ে যাচ্ছে। আমি সাইফুলের কাছে সুবিধা নিয়েছি, নিজের পরিবার হত্যাকারীর আশ্রয়ে থেকেছি। অনিলের বউর সাথে আরো মেয়েরা যোগ দিল। তাদের দোষ নেই, তাদের তুলনায় আমার শরীর স্বাস্থ্য ভাল, গায়ে পোষাক আছে - এ অবিচার তারা মানতে পারল না। তাদের প্রবল গালাগালে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা আমাকে বললো, তুমি গ্রাম ছেড়ে চলে যাও। আমি মাথা নাড়লাম, সাইফুলের ঘরে গিয়ে একটা পুটুলিতে কিছু কাপড়চোপড় বেধে বেরিয়ে পরলাম। বাজারের কাছে এসে, একটা নৌকায় উঠলাম। সে জিগেস করল, কই যাবেন? বললাম, চট্টগ্রাম। ইন্ডিয়া আর যেতে সাহস হল না, আমার সমাজ কে আমি ততক্ষণে বুঝে ফেলেছি। আমার বেচে থাকা আত্নীয়দের আমি বিব্রত করতে চাই না, আমি মরে গেছি - এটাই তাদের জন্য সবচেয়ে স্বস্তিদায়ক বিষয় হবে। হয়ত কিছুটা মায়াও অবশিষ্ট থাকবে মনে। জীবিত আমি অথবা মাঝরাতে হানা দেয়া অপ আত্না এখন তাদের কাছে সমার্থক। এর চেয়ে সেই মাদ্রাসায় গিয়ে দেখি কপালে কি আছে?

৬

চট্টগ্রাম যেতে মেলা হাংগামা পোহাতে হল। প্রথমে চাঁদপুর, এরপর বাসে চট্টগ্রাম। আমি কোনদিন গ্রামের বাইরে যাই নাই। নৌকায় বসে থাকতে থাকতে পানিতে ভেসে যাওয়া লাশ দেখলাম, প্রচণ্ড দুর্গন্ধ। আশেপাশে অনেক শকুন ও দেখলাম, যুদ্ধের আগে অত শকুন দেখা যেত না। কেমন অশুভ লাগে দেখতে।

বাসে উঠার পর, আরো যাত্রী ছিল সাথে। সবাই যুদ্ধ বিষয়ক আলাপে ব্যস্ত। কে জিতবে, পাকিস্তান থাকবে নাকি, শেখ সাহেব কে কি করবে, ইত্যাদি। এমন সময় গাড়ির হেল্পার বললো, সামনে চেক পোস্ট। মহিলারা সব মাথায় কাপড় দেন, পাচ কলেমা মনে রাখেন। উনাদের সাথে তমিজের সাথে কথা বলবেন। বেশি ভয় পাবেন না, পেলে ধরে নিয়ে মেরে ফেলবে।

সংগে সংগে পুরো বাস নিশ্চুপ হয়ে গেল। লোকজন কে দেখে মনে হল, তাদের মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। একজন বৃদ্ধা তার ছেলের হাত চেপে ধরলেন। ছেলেটির বয়স ২০-২৫ হবে, মুক্তি হবার বয়স। এদের ই বেশি ধরে মেরে ফেলে। একজন মহিলা তাড়াতাড়ি নেকাব নামিয়ে দিল। আমার বোরখা ছিল না, আমি শাড়িটাই টেনেটুনে মাথায় জড়িয়ে বসে রইলাম। এদের মধ্যে আমিই একা, অল্পবয়স্ক, কলেমাও জানি না । ভয়ে আমার হাত পা কাঁপতে শুরু করল। এরা কি আমাকে ধরে নিয়ে যাবে? অনিলের বউর মত অবস্থা হবে। এমন সময় পেটের ভিতর আমার ছেলে লাথি মারল। আমার গলা শুকিয়ে গেল। একটু পানি যদি কোথাও পাওয়া যেত। ভগবান!

একজন মধ্যবয়সী পাকিস্তানি সৈন্য উঠল। বললো আমাদের সবাই কে নেমে দাঁড়াতে। আমরা নেমে দাঁড়ালাম। সব মিলিয়ে ৩০ জন। সেই ছেলেটাকে রেখে দেওয়া হল। বৃদ্ধা ওদের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। তাকে লাথি দিয়ে সরিয়ে দেয়া হল। বৃদ্ধা আবারও তার ছেলের হাত আঁকড়ে ধরল। ছেলেটা ভাঙা গলায় বললো মা, তুমি যাও। আরো যেন কি বলছিল মনে নেই। পাকিস্তানি রা খুব বিরক্ত হল। রেগে গিয়ে ওই মুহূর্তেই দুজন কে গুলি করে মেরে ফেল্ল। উর্দুতে কি এক গালি দিল, বুঝলাম না।

বাকি মানুষ জন ভয়ে নিশ্বাস ও ফেলছিল না। কয়েক ফুট দূরে নিশ্চিত মৃত্যু রেখে দাঁড়িয়ে থাকা খুব সহজ ব্যাপার না। এর মধ্যে একজনের নজর পরল আমার উপর। সে হাসিমুখে এগিয়ে এল, ইয়ে ত খুব সুরত লাড়কি হ্যায়। বাকিদের ইশারায় চলে যেতে বললো, সবাই হুরোহুড়ি করে বাসে উঠে গেল। বাস বিকট শব্দে ইঞ্জিন চালু করে দ্রুত উধাও হয়ে গেল। আমার বদলে প্রাণ ফিরে পেয়ে হয়ত তারা খুব আনন্দিত হয়েছিল। বেচে থাকার চেয়ে আনন্দদায়ক আর কি হতে পারে?

পাকিস্তানি সৈন্য টি আনন্দিত ভঙ্গী তে আমার চারপাশে হেটে হেটে দেখতে লাগল। বছরখানেক আগে এক বর্ষায় আমাদের খাটের নিচে একটা কালসাপ ফণা তুলে বসেছিল। এই লোকটিকে আমার তেমন ই লাগছিল।

সে আমাকে জিগেস করল, নাম কি?

- মনিরা বেগম। হিন্দু পরিচয় দেয়ার মত সাহস হল না।

- কিধার যাতা হ্যায়?

- চট্টগ্রাম।

- কিসকে পাস?

মাদ্রাসার নাম বললাম। সে একটু থমকে গেল। বললো, উধার ক্যায়া কাম তুমহারা? কোই জান পেহচান হয়? তোমহারা মরদ কৌন হ্যায়?

উর্দু জানি না। অনুমান করলাম, কার কাছে যাব, স্বামীর পরিচয় এসব জানতে চাইছে। বাংলাতেই বললাম, স্বামী সাইফুল, সে যুদ্ধে নিখোঁজ, ইশারায় পেটে বাচ্চা দেখালাম। বললাম, সেখানে আশ্রয় নিতে যাচ্ছি। মাদ্রাসার হুজুরের নাম মাওলানা নাসিরুল্লাহ।

পাকিস্তানি টার লোলুপ চেহারা আচমকা ভদ্রলোকে পালটে গেল। সে হাসিমুখে বললো, ইয়ে ত হামারা বেরাদরি কি হ্যায়। তুমহারা মরদ রেজাকার থা? মাশাল্লাহ। তোম হামলোগ কি সাথ চল।

অগত্যা আমি তাদের সাথে রওনা দিলাম। পেছনে বৃদ্ধা আর তার ছেলে রক্তের মধ্যে উপুড় হয়ে পরে রইল। তাদের লাশের কি হল, তা আর জানা হয় নি।

পাকিস্তানি দের সাথে ক্যাম্পে গেলাম, তারা আরেকজন রাজাকার কে বললো আমাকে মাদ্রাসায় পৌঁছে দিতে। মোটামুটি ঝামেলা ছাড়াই সেই মাদ্রাসায় পৌছে গেলাম।

নাসিরুল্লাহ হুজুর আমাকে তার তিন বউর হাতে তুলে দিল। তারা আমাকে দেখে কিছুটা অবাক হল, বোরখা নাই, মুসলমানি আদব নাই, নিজেরাই জিগেস করল আমি এতিম কি না? বিয়ে হয়েছে কি না? আমি বললাম, হ্যা। কয়েক মাস আগে বিয়ে হয়েছে, সাইফুল যুদ্ধে নিখোঁজ। বড় বিবি খুব দুখ পেলেন, সাইফুল তাকে মা ডাকত। পড়ালেখায় ভাল ছিল বলে নাসিরুল্লাহ হুজুর তাকে বেশ আদর করত।

আমি সেখানে থাকতাম। ঝিয়ের কাজ করতাম, খেতে পরতে পেতাম। তারা আমাকে নামায পরা, সুরা, কলেমা শেখালেন। আমিও মুসলমান সেজে রইলাম। বাইরের খবরাখবর অন্দরমহলে পৌঁছায় না, আমিও জানি না। ৭ মাসের সময় হঠাত প্রসববেদনা উঠল, বড়বিবিই দাই এর কাজ করলেন। বাচ্চার কান্নাও শুনলাম। সকলে খুশি হলেন, ছেলেবাচ্চা। বাচ্চাটা খুব দুর্বল ছিল, দুধ টেনে খেতে পারত না। মেজবিবি ঝিনুকে করে গরুর দুধ খাওয়াতেন। তার নিজের বাচ্চা ছিল না, ছেলে টাকে বেশ আদর করতেন। আমি ঘরের কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকতাম, তিনি বাচ্চা নিয়ে থাকতেন। অগ্রহায়ণের শেষে একদিন কাউকে কিছু না বলে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলাম। এরপর ঢাকার ট্রেনে উঠে বসলাম।

- চাচী, ও চাচী! উকিল ম্যাডাম আসছেন। কথা বলবেন না? সুফিয়া বলে।

হঠাৎ এক ধাক্কায় ১৯৭১ থেকে ২০১৫ সালে এসে পরে মালতি অথবা মনিরা বেগম।

হ্যা। কথা বলব, আমারে এক গ্লাস পানি দিবা?

শীরিন রহমান হাসিমুখে মালতি কে অভ্যর্থনা জানায়। বলুন, কেস সম্পর্কে যা জানেন, যা বলতে চান।

উপরোক্ত ঘটনা সংক্ষেপ বলা হয়ে যায় দুই মিনিটেই। শিরিন রহমান শান্ত গলায় বলেন, আপনি এখন কোথায় থাকেন? কি কাজ করেন? আপনার পরিচয়?

৭

-আমি এখন ময়মনসিংহ থাকি। ফুলবাড়িয়া থানায়, ফুলবাড়িয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে দপ্তরীর কাজ করি, প্রায় ২৫ বছর। সেখানকার হেডমাস্টারের বাড়িতেই থাকি।

- আপনার পরিচয়পত্র আছে? ভোটার আইডি কার্ড?

- এই যে।

কার্ড টা হাতে নিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন শীরিন।

- কার্ডে ত নাম লেখা মনোয়ারা বেগম। আপনি কি পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন?

মনোয়ারা বেগম একটু থমকে যান। সেরকম আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু করা হয় নি। একা মেয়ে হয়ে যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আর হিন্দু পরিচয়ে থাকা টা সুবিধাজনক হয় নি। এদিক ওদিক ঝিয়ের কাজ করতে হত। হিন্দুদের অনেকে কাজে রাখতে চাইত না। তাই, কেউ নাম জিগেস করলে বলত মনোয়ারা। যুদ্ধের পর সব কিছু এলোমেলো, দুর্ভিক্ষ, কোথাও গিয়ে সাহায্য চাইতে হবে- সে বুদ্ধিও কেউ দেয় নি। সুন্দরি যুবতী, হিন্দু হয়ে কোথায় আশ্রয় খুঁজতে যেত? তাদের ধর্মে বড় অল্পতেই জাত যায়। মুসল্মান হয়ে যে হুজ্জোত একেবারে এড়ানো গেছে, তা না, অনেকের লোলুপ দৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচাতে হয়েছে। তবে অনেক দয়ালু মহিলা ছিল, যারা তাকে সাহায্য করেছে। বাড়িতে কাজ দিয়েছে, খেতে পরতে দিয়েছে। একজন তাকে স্কুলের দপ্তরীর কাজ টাও যোগাড় করে দিয়েছিল।

- না, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি নাই। হিন্দু হলে অনেকে কাজ দিতে চাইত না, তাই এই নাম নিছিলাম।

- কোর্টে কেস করবেন কি নামে? মনোয়ারা বেগম ই যে মালতি দাস তা প্রমাণের উপায় কি? কোর্ট ত প্রমাণ চাইবে। মাধবপাশা গ্রাম বা কলকাতায় কেউ আপনাকে মালতি বলে সনাক্ত করতে পারবে?

মালতি দাস হতভম্ব হয়ে বসে রইলেন। এখন কি হবে? তবে কি সে তার পরিবার হত্যার বিচার পাবে না? যুদ্ধের পর বাঁচার তাগিদে সে তার পরিচয় লুকাতে ব্যস্ত ছিল, পরিচিত কারু সাথে আর যোগাযোগ রাখে নি। প্রায় ৪০ বছর আগের মাধবপাশায় তাকে কে চিনবে?

- আমি ত জানি না, মা। আমি কি তাইলে বিচার পামু না? কেঁদে ফেলেন মালতী দাস।

- আপনি শান্ত হন। আমরা মাধবপাশায় খোজ নিয়ে দেখব। হতে পারে, আপনার চাচারা যুদ্ধের পর ফিরে এসেছিলেন, উনার নাম কি?

- কার্তিক দাস।

হাসান এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। এবার কথা বললো, ফিরলেও, উনার চাচা কি আর বেচে আছে? প্রায় ৪২ বছর আগের কথা।

- তার ছেলেমেয়ে রা পারবে, কি পারবে না?; শিরীন রহমান মালতি কে জিগেস করেন।

- ওরা অনেক ছোট ছিল, একজন চার, আরেকজন দুই বছর। আমার কথা ওদের মনে থাকবে না।

- আপনার কথা ত জানবে, অন্তত। হাসান, তুমি মাধবপাশায় খোজ নাও, বৈকুণ্ঠ দাসের কোন বংশধর, আত্নীয় সেখানে আছে কি না। দরকার হলে

কলকাতা তেও খোজ নেয়া যেতে পারে। কলকাতায় আপনার আত্নীয় রা কোথায় থাকেন, জানেন?

- না গো মা। তারার ঠিকানা জানি না। বাবা জানতেন, কোনদিন জিগেস করি নাই।

- আচ্ছা, আমরা চেষ্টা করব। আপনি কেস কোর্টে উঠলে সাক্ষী দিতে আসবেন।আগে ত মামলা কোর্টে উঠুক। সাওয়াল জবাবে সাইফুল তালুকদার স্বীকার করতেও পারেন।

মালতি চোখ মুছে। আচ্ছা, মা। এই নেন, আমার মোবাইল নম্বর। ফোন দিলে চলে আসব নে। মা গো, আমি ত ফি দিতে পারমু না। দপ্তরীর কাজ করি, টাকাপয়সা তেমন নাই।

- না, টাকা লাগবে না। এ মামলার বাদী রাষ্ট্র।

- আমি তাইলে যাই। রাতের ট্রেন ধরমু।

- আচ্ছা, যান। সাবধানে থাকবেন। ভাড়া আছে?

- আছে, দেড়শ টাকা।

আরো ৫০০ টাকা দিলেন শিরীন রহমান। মালতি বিদায় নিলেন।

রাত বাজে প্রায় ৮ টা। হাসান কে বাড়ি যেতে বললেন শিরীন রহমান। আগামীকাল, মাধবপাশায় খোঁজখবর করতে হবে।

অত্যন্ত বিরক্ত লাগছে হাসানের। এই কেসের কোন আশা সে দেখতে পাচ্ছে না। এই মালতি দাসের উপর ও তার তেমন কোন সহানুভূতি হচ্ছে না। মহিলা কে তেমন সুবিধার মনে হচ্ছে না। যুদ্ধের সময় দিব্যি সাইফুলের আশ্রয় প্রশ্রয়ে

নিরাপদে থেকে এখন বিচার চাইছে। কি আবদার! এখন মাধবপাশায় খোজ নাও; আরে বাবা, সে পড়েছে ওকালতি। এখন কি সে ব্যোমকেশ বক্সি হয়ে ক্লু খুঁজবে? যত ফালতু ঝামেলা। এই একাত্তুর ফেকাত্তুর তার আর পোষাচ্ছে না। কোন দিন আবার কোন মাথাগরম মোল্লা তাকেই কুপিয়ে দেয়, কে জানে। সাইফুল তালুকদার ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসেবে অনেক জনপ্রিয়। তার ওয়াজ মাহফিলে নাকি অনেক হিন্দু মুসল্মান হয়ে যেত। বিশাল নেটওয়ার্ক এদের। সৌদিআরব, তুরস্ক থেকে লবিং হচ্ছে সাইফুল তালুকদার কে বাঁচাতে। এর বিরুদ্ধে কাজ করার চেয়ে বাঘের খাচায় নাচানাচি করাও নিরাপদ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাসান, অন্য কোন ল ফার্মে জব ট্রাই করবে। দেশপ্রেমে অরুচি ধরে গেছে তার। কোপ খেয়ে রাস্তাঘাটে মরে থাকার শখ নেই তার।

দেড়মাস পর, কোর্টে কেস উঠে সপরিবারে বৈকুণ্ঠ দাস হত্যামামলার। চাক্ষুষ সাক্ষী, মনোয়ারা বেগম ভুতপুর্ব মালতি দাস। সাওয়াল জবাবে সাইফুল তালুকদারের উকিল মালতি পরিচয়ের প্রমাণ চান। উকিল সাহেব লন্ডনে প্র্যাক্টিস করা। তার গমগমে কণ্ঠস্বর, ব্যক্তিত্ব, কঠিন আইনি ভাষা ঘাবড়ে দেয় মালতি দাস কে। কি প্রশ্নের কি উত্তরের, কি মানে বানিয়ে আরেক টু হলে প্রমাণ করে ফেলেছিল, মালতি দাস একজন বানোয়াট ভাড়াটে সাক্ষী। শিরীন রহমান কে ওকালতি শিখে আসতে পরামর্শ দিয়ে বলেন; কোর্ট উপন্যাসের পাতা না, যেখানে দেশপ্রেমের সস্তা বুলি ঝেড়ে, সাক্ষিকে শিখিয়ে পড়িয়ে আনলে একজন নিরাপরাধ ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া যাবে।

শিরীন রহমান প্রমাণাদি জোগাড় করতে আরো কিছু সময় চাইলেন, মাধবপাশা গ্রামে কাউকে পাওয়া যায় নি মালতি কে সনাক্ত করার মত । সাক্ষীর

নিরাপত্তার জন্য, সেফ কাস্টডি চাইলেন। আদালত সময় দিলেন, তবে সেফ কাস্টডি দেয়া হল না। সাক্ষী কে সাবধানে থাকতে নির্দেশ দেয়া হল, বিপদ বুঝলে পুলিশ কে জানাতে বলা হল।

কোর্ট থেকে বেরিয়ে শিরীন রহমান, মালতি দাস কে খুব সাবধানে থাকতে বললেন। খুব শীঘ্রই তার জন্যে একটা নিরাপদ জায়গা বের করতে হবে। মালতি দাস বিদায় নিয়ে একটা রিক্সায় উঠলেন, গন্তব্য কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে ময়মনসিংহ।

পথিমধ্যে, মনোয়ারা বেগমের সামনে একটা বড় মাইক্রোবাস এসে দাঁড়াল। সুন্দর পরিপাটি কাপড় চোপড় পরা কয়েকজন ভদলোক নামল। নেমে সুন্দর করে সালাম দিয়ে বললো, চাচি ভাল আছেন?

মালতি দাস অস্বস্তির সাথে বললেন, হ্যা ভাল। কি চান আপ্নারা? এই লোকগুলি ভদ্রলোক হলেও কেমন যেন ভয় লাগছে। বহুকাল আগের যুবক সাইফুলের সাথে এদের কেমন যেন মিল আছে।

তারা অভয় দিয়ে বললেন, চাচি আমরা সরকারি লোক। আপনি গুরুত্বপুর্ণ মামলার সাক্ষী, তাই সরকার আমাদের পাঠিয়েছে আপনার সুরক্ষার জন্য। এখন থেকে আপনি আমাদের হেফাজতে থাকবেন।

- কিন্তু আমি ত স্কুলে বলে আসি নাই। চাকরি চলে যাবে, বাবা।
- স্কুলে আমরা জানিয়ে দেব। অসুবিধে নেই।
- তবু, বাবা।
- চলুন, এই গাড়িতে আপনার স্কুলে জানিয়ে তারপর আপনাকে নিয়ে যাব।
- না, মানে।

একটা হিজাব পরা মেয়েও গাড়ির ভেতর থেকে মিষ্টিসুরে বলে, আসুন, কোন ভয় নাই। তারপর বের হয়ে এসে মালতির হাত ধরে গাড়িতে বসায়। বলে, পানি খাবেন?

মালতি পানির বোতল হাতে নেয়। গাড়ির দরজাও বন্ধ হয়ে যায়। মেয়েটি একজন ডাক্তার, খুব বেশি সময় লাগে না। মালতি অদৃশ্য হয়ে যায়। পরদিন ফোন করে শীরিন রহমান ফোন বন্ধ পান। মালতির স্কুলে ফোন করে জানতে পারেন, সে আর কাজে যোগ দেয় নি। বাড়িতেও ফিরে আসে নি। নিখোঁজ হিসেবে থানায় জিডি করা হয়, কিন্তু কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।

পরবর্তী সুনানিতে সাক্ষী অনুপস্থিত; এই মামলাটিতেও খালাস পেয়ে যান, সাইফুল তালুকদার। তিনি সন্তুষ্টি তে মাথা নাড়েন, তার শিষ্য রা তার চেয়ে অনেক দক্ষ। ৪৪ বছর আগে, মালতি কে জীবিত ছেড়ে দেয়াতে এই ঝামেলা হল। অকৃতজ্ঞ মালাউন বেটি। বিরক্ত হন নিজের অল্পবয়সের বোকামি তে।

নিউজপেপার আর ফেসবুক পেইজে লেখালেখি হয়, মিথ্যা সাক্ষী এনে হয়রানি করা হচ্ছে সাইফুল তালুকদার কে। ভুয়া হিন্দু সাক্ষী কে আর পাওয়া যাচ্ছে না। সে বর্ডার ক্রস করে ইন্ডিয়া চলে গেছে, তাকে নাকি ইন্ডিয়াতে সিঁদুর দেয়া অবস্থায় দেখা গেছে। দেশের ধার্মিক লোকেরা গাল পারে ট্রাইব্যুনাল কে, মিছিমিছি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে সাইফুল তালুকদারের মত আলেম দের এভাবে মিথ্যা হয়রানি করায়।

কেসের ফাইল টা যত্ন করে তুলে রাখেন শীরিন রহমান। শেষবার সাইফুল তালুকদারের চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝেছিলেন, মালতির অভিযোগ নির্জলা সত্যি ছিল।

তবু প্রমাণাদির অভাবে - মালতির জন্য দু ফোটা চোখের পানি পরে তার।

হাসান এসে জানাল, সে একটা কর্পোরেট ল ফার্মে জব পেয়েছে। শিরীন রহমান তাকে শুভকামনা জানিয়ে বিদায় দেন।

হাসানের বিয়ে সামনের মাসে। ভাল চাকরি, নিরাপদ জীবন। অনেক মালতির জীবনের বিনিময়ে পাওয়া একটি স্বাধীন দেশে হাসান সুখেস্বাচ্ছন্দে বসবাস করতে লাগল।

সাইফুল তালুকদারের ও আর দু তিন টি মামলা বাকি আছে। তিনিও অপেক্ষা করেন, মুক্তির- এমন একটি দেশে যার জন্ম তিনি কিছুতেই চান নি।

অবর্তমানে

রিফাত আজ খুব ব্যস্ত। বাড়িভর্তি আত্নীয়স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী। আরো অনেকেই আসছেন, সকলেই এসে রিফাতের খোজ করছেন। নিজের পরিচয় দিচ্ছেন, জানতে চাইছেন কিভাবে কি হল। আবার পরামর্শ ও দিচ্ছেন, রিফাতের আসলে কি করা উচিৎ ছিল। এও বলছেন, আসলে সব আল্লাহর ইচ্ছে, রিফাতের উচিৎ ধৈর্য ধরা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এসব শোনার মত সময় রিফাতের নেই, তার হাতে অনেক কাজ। বাড়িভর্তি মানুষ, তবু সব কাজ ই তার দেখতে হচ্ছে। আরো দুইবোন আছে তার, একজন স্বামী সন্তান নিয়ে দেশের বাইরে, আরেকজন এবার জেএসসি দিয়েছে। রিফাতের বন্ধুরা এসেছে, তারা সাহায্য করার চেষ্টা করছে। তার বেশ খিদে পেয়েছে, গত সন্ধ্যা থেকে এখন দুপুর বারটা পর্যন্ত কিছু খাওয়া হয় নি। নিজে থেকে খেতে পারছে না, এখন নিজে নিজে চেয়ে খাওয়াটা বড় বিব্রতকর লাগছে।

মেঝচাচা জানতে চাইলেন, দেশের বাড়ি যাওয়া হবে কি না। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন, যার উত্তর সে জানে না। মাকে জিগেস করে লাভ নেই, এর উত্তর দেয়া মার জন্যেও কঠিন। তবু উত্তর ঠিক করতে হবে আর এক ঘন্টার মধ্যেই, হাতে সময় নেই।

রিফাতের মা, রায়হানা বেগম থমথমে মুখে খাটে বসে ছিলেন। আশেপাশে আরো জনাবিশেক মহিলা। দেশের বাড়ির কথা জিগেস করাতে তিনি কেঁদে উঠলেন আবারো, রিফাত অপ্রস্তুত ভঙ্গী তে দাঁড়িয়ে রইল। রায়হানা বেগম বললেন, তোমার চাচারা যা বলে কর। আমার ইচ্ছে নেই যাওয়ার।

রিফাত চুপচাপ জানিয়ে দিল, বাড়ি যাওয়া হচ্ছে না। রিফাতের বন্ধু সজিব এসে বললো, বরইপাতা পাওয়া গেছে, মৌলানাসাহেব গরম পানি, নতুন সাবান, কাফন এসবের ব্যবস্থা করতে বলেছেন। রিফাত কাজের মেয়ে ময়না কে পানি গরম দিতে বলে গ্যারাজে নামে

লাশ অথবা রিফাতের বাবা আব্দুল জলিল চৌধুরী খাটিয়ায় শুয়ে আছেন। গত রাতে অফিস থেকে ফিরে বললেন, বুক জ্বালা করছে, অফিসে নাকি কে সবাইকে তেহারি খাইয়েছে সেই কারণে । রিফাত ফার্মেসি থেকে এন্টাসিড এনেছিল, সাথে দুইটা সেকলো। তবু জলিল সাহেব বললেন একটা রিক্সা ডাক রিফাত, একবার ডাক্তারের কাছে যাই। রায়হানা ভয় পেয়েছিলেন বেশ, জলিল সাহেব অভয় দিয়েছিলেন ভয়ের কিছু নেই। রিক্সা থেকে নেমে হাসপাতালের দিকে হাটতে গিয়ে জলিল সাহেব হঠাৎ বসে পরলেন। রিফাত হতভম্ব হয়ে, আব্বু কি হয়েছে তোমার বলতেই জলিল সাহেব রিফাতের হাতের উপর এলিয়ে পরে আক্ষরিক অর্থেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। রিফাতের চিৎকার এ আশেপাশের

লোকে রা ধরাধরি করে ট্রলি তে উঠানোর পর ডাক্তার পরীক্ষা করে চোখে টর্চ মেরে নিশ্চিত হলেন, জলিল সাহেব আর বেঁচে নেই, রিফাত চাইলে ইসিজি করা যেতে পারে।

মৌলানাসাহেব আবার তাড়া দিলেন, দেরি হয়ে যাচ্ছে। বাদ জুম্মা জানাজা ধরতে হলে এখনই মাইয়্যেতের গোসল, কাফন শেষ করতে হবে। রিফাত কি বাবা কে গোসল দিতে চায়? তাহলে যেন অজু করে পাক পবিত্র হয়ে আসে। রিফাত যন্ত্রের মত বাবা কে শেষ গোসল দিল, স্কুলে থাকতে মাঝেমধ্যে ই জলিল সাহেব রিফাত কে গা ডলে গোসল করিয়ে দিতেন, সে কথা মনে পরে গেল। পার্থক্য, সে বাবার কথামত হাত উঁচু করতে পারত, মাথা হেট করতে পারত, বাবা পারছেন না, কেমন শক্ত হয়ে গেছেন।

গোসল, কাফন পরানো, আতর দেয়া, আতর মাখা তুলো নাকে কানে গুজিয়ে দিতে দিতে রিফাত ভাবছিল, জীবনের প্রথম এই কাজ টা করছে, আজই প্রথম সে মৃত কে গোসল দিচ্ছে, মৃতজন তার বাবা।

একটুপর লাশ পাড়ার মসজিদে নিয়ে যাওয়া হবে। শেষ তদারকি করছেন ছোট খালু। মহিলাদের শেষবারের জন্য লাশ দেখিয়ে নিতে ডাকা হয়েছে। রায়হানা বেগম আর ছোটবোন রুমকি কে নিয়ে এসেছে খালা, ফুপু, চাচিরা। রায়হানা বেগম খাটিয়া ধরে কাঁদতে লাগলেন, তার সাথে রুমকি। কে যেন তাদের কাঁদতে নিষেধ করল, এতে নাকি মৃতের কষ্ট বাড়ে।

রিফাত চুপচাপ দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল, যদিও না দেখতে হলেই ভাল ছিল। মনের একটা অংশ প্রাণপণে বলছিল, এটা একটা কুৎসিত দু:স্বপ্ন। তার ঘুম ভাংবে জলিল সাহেবের ডাকে, রিফাত ওঠ, আর কতক্ষণ ঘুমাবি?

দু:স্বপ্ন দীর্ঘায়িত হতে লাগল। বাদ জুম্মার দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে, মহিলারা রায়হানা কে টেনে উঠালেন। রায়হানার কান্নার মধ্যেই এক সময় খাটিয়ার সামনের হাতল রিফাতের কাঁধে উঠে এল। বেশ ভারি। গতকাল থেকে ছোটাছুটি করতে করতে ক্লান্ত, অভুক্ত রিফাত শ্লথ পায়ে চলতে লাগল। চারদিক থেকে ধ্বনিত হচ্ছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদ রাসুল্লাহ স:। রিফাত গলায় তেমন জোড় পাচ্ছে না, বরঞ্চ গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। খুব অদ্ভুত ভাবে খাটিয়ার ভার বেড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে হল, বাবা এতদিন যে ভার বহন করে আসছিলেন, তা এক রাতের ব্যবধানে রিফাতের কাধে এসে ভর করেছে।

জানাজা শেষে ইমাম সাহেব রিফাত কে বললেন, বাবার হয়ে সবার কাছে ক্ষমা চাও, বল আপ্পারা সবাই আমার বাবাকে মাফ করে দেবেন, কারু কাছে ঋণ থাকলে আমাদের বলবেন, আমরা তা শোধ করব, এখন উনার উপর কোন দাবী রাখবেন না। এ কয়টা বাক্য বলতে রিফাতের গলা ধরে গেল।

গোরস্থান গেল সবাই। কবর খোদাই ছিল, আরো দুজনের সাথে কবরে নামল রিফাত। আজ থেকে এটাই আব্বুর ঘর। অতি যত্নে বাবাকে ধরে নামাল সে।

বাড়ি ফিরে এল, মায়ের দিকে তাকিয়ে বুক টা ধ্বক করে উঠল। জানাযার সময় টা কারা যেন মাকে একটা কুৎসিত সাদা শাড়ি পরিয়ে দিয়েছে। রিফাত চোখ ফিরিয়ে নিল।

ছোটখালা রিফাত কে খেতে ডাকলেন, প্রচণ্ড খিদে ছিল, তবু খাওয়া দেখে কেমন যেন খিদে মরে গেল। অল্প কিছু খেয়ে উঠে পরে রিফাত। রায়হানা এখনো

কেঁদেই যাচ্ছেন, তার সংসার ভবিষ্যৎ এসবের কি হবে প্রশ্ন করছেন। সাথের মহিলা রা আশ্বাস দিচ্ছেন, সবই আল্লাহ ঠিক করে দেবেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্ল রিফাত। মৃতের দায়িত্বের দায়ভার নেওয়া টা বড় একটা প্রশ্ন, যার উত্তর তার কাছে নেই। ঘড়ির দিকে তাকায় রিফাত, সন্ধ্যা সাত টা, আব্বু এ সময় ই ঘরে ফিরত অফিস শেষে। আজ আর কেউ দরজা ধাক্কাবে না, রিফাতের ও তটস্থ হতে হবে না, ফোন, গেমস সব গুটিয়ে ফেলার জন্য। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হবার সে ব্যাকডেটেড আইডিয়া দেবার লোক টাকে সে বড্ড মিস করছে। আজ আর তার মেটাল ব্যান্ড দ্য রেভুলশনিস্ট এর লিড গিটারিস্ট হতে মন চাইছে না। আসলেই, গান গেয়ে সংসার চালানো যায় না। এক রাতেই সে ব্যাকডেটেড হয়ে গিয়ে ভাবছে, কোন জীবিকায় সংসার চালানো যায়।

(গল্প এখানেই শেষ অথবা সংগ্রামের এখানে শুরু। গতদিন এক জুনিয়র ফ্রেন্ড মেসেজ দিয়েছিল, আপু abbu passed away. থম ধরে বসেছিলাম, ওকে সান্তনা দেবার মত একটা কথাও খুঁজে পাইনি। অনেক দিন ই ফেসবুকে মৃত্যুসংবাদ দেখি। কারু বাবা, কারো স্বামী, ভাই, কলিগ মারা গেছেন। গেল বছর, আমার বান্ধবীর ৮ বছরের মেয়ে টা ক্যান্সারে ভুগে মারা গেল, অনেকবার ফোন হাতে নিয়েও তাকে কিছু বলা হয় নি। কি বলব? কি বলার আছে?)

বাড়ি ফেরা

আজ কিছুদিন ধরেই আংগুরির কথা খুব মনে হচ্ছে তপতীর। আংগুরি ছিল তপতিদের বাসার কাজের মেয়ে। তপতী তখন বেশ ছোট, বয়স ৭-৮ হবে। এসময় আংগুরিকে জামালপুর থেকে এনে দেয়, বুয়াদাদী। তার নাম আর এখন তপতীর মনে নেই।

আংগুরির বয়স ১৫-১৬ ছিল। হাসিখুশি, কাজ ও করত ভাল, তপতীকে খুব আদর করত। সকালে স্কুলে যাবার সময় বেনী করে ফিতা বেধে দিত, রাতে গল্প বলে ঘুম পাড়াত। আংগুরির মাসিক বেতন ছিল ৩০০। মনে পরলেই হাসি পায় তপতীর। ৫ ইউরো তে সারামাস ২৪ ঘন্টা বাধা কাজের লোক, ভাবা যায়?

আরো কিছু ভাবার আগেই উঠে পরল তপতী। ভাব বিলাসিতার সুযোগ নাই, এখন বাজে নয়টা। তার ছেলে তামিম উঠে পরেছে। তাকে বাথরুম, খাবার ইত্যাদি শেষে রান্না করতে হবে, এরপর কিচেনের সমস্ত ধোয়াধুয়ি, ছেলের গোসল, দিন টা ফুরুত করে চলে যায়।

প্রতিদিনের মতই তামিম ভালই ঝামেলা করল, একটা পরোটা নিয়ে সারাঘর দৌড়ে তাকে খাওয়াল, এরমধ্যেই তিন বার বমি করার ভাব ভংগি করল তামিম। বহুকষ্টে ছেলে থাপ্পড় দেয়া থেকে নিজেকে বাচাল তপতী। মেরে ধরে নিজের ই মন খারাপ হয়, আরো কিছু সময় নষ্ট হবে মন খারাপ হলে।

তামিম টয়বক্স থেকে খেলনা নামাচ্ছে। নিমিষেই ফ্লোর ভর্তি হয়ে গেল লেগো, পাজল, ট্রেন ইত্যাদি তে। গতকাল ই ঘর টা গুছিয়ে রেখেছিল, আজকে আবার গোয়াল ঘর। মাঝেমধ্যে সব খেলনা গারবেজে ফেলে দিতে ইচ্ছা করে।

আলু কাটার জন্য পিলার হাতে নিতেই আংগুরির কথা আবার মনে হল। সে যখন বটিতে ঘ্যাচঘ্যাচ করে, আলু, পিয়াজ এসব কুটত অবাক হয়ে দেখত তপতি। হাত কেটে যায় না কি আশ্চর্য। মিহি করে কাটা সব্জির সাথে পাতলা হাতে বানানো রুটি। এক সময়ের এই নিত্যকার মধ্যবিত্তের খাবার এখন আর সম্ভব হয় না খাওয়া। ছোট থাকতে মাখন রুটি জ্যাম এসব ছিল বড়লোকদের খাবার। এখন দায়ে পরে খেতে হয়, কি আশ্চর্য।

আংগুরি ভাল কাজ করত, স্বভাব ও ভাল ছিল। সবাই তার কাজে খুশি। তপতির মা হেলেন ব্যাংকে চাকরি করতেন, বাসায় লোক থাকা খুবই দরকার। তবু মাস ছয়েক পরে আংগুরি বিগড়ে গেল। সে বাড়ি যেতে চায়। তাকে বাড়ি পাঠানো অত সহজ না, কে নিয়ে যাবে? হেলেন ভাবলেন বেতন বেশি চায় মনে হয়, ৫০০ টাকা করে দিলেন। তখন হেলেনের নিজের বেতন ই ৫ হাজার মাত্র। আংগুরি তবু মানে না, খুনখুন করে কাদে। তারপর হঠাৎ একদিন পাড়ার রিক্সাওয়ালা শুক্কুরের সাথে পালিয়ে গেল। শুক্কুর নাকি তাকে দেশেরবাড়ি নিয়ে যাবে। অনেক ঝামেলা হয়েছিল, সেগুলি আর তপতির মনে নেই।

মাছ, মুরগি আর ভাজি রান্না করছে তপতী। আজকাল কেন যেন কোন কিছু স্বাদ লাগে না। একে তাকে জিগেস করে রেসিপি, খাতাকলম নিয়ে ফোনে মায়ের কাছে জিগেস করে করলা কিভাবে ভাজে, কাচকলার তরকারি? তবু মজা হয় না।

তামিমের জন্য আবার নুডলস রান্না করল, ছেলেটা খাবার নিয়ে এত যন্ত্রণা করে। হেলেন কে জিগেস করলে হাসে, বলে তুইও জালিয়েছিস। ঠিক হয়ে যাবে বড় হলে। কত বড় হলে ঠিক হবে কে জানে।

এমন সময় জোতি আপা ফোন করল। আপা দেশে গেছিল, হেলেন ৫ কেজির মত জামাকাপড় পাঠিয়েছে, তপতি, রাজিব আর তামিমের জন্য । সেগুলি আনতে যেতে হবে। খুশি খুশি লাগে তপতির।

সব কাজ শেষ করে ফোন হাতে সোফায় বসল একটু। তামিম এসে কোলে উঠে পরল, মনযোগ চাই, আদর চাই, মামি লেটস গো পার্ক, স্লাইড - উহিইইই- এই বলে তপতির ঘাড়ে উঠে এক লাফ দিল। দ্রুত হাতে আটকাল তপতি, কোন দিন যে ঘাড় ভাংবে এই ছেলে। এক বাচ্চার যে কত কি চাই। হাফ ধরে যায় তপতির। কাজকর্ম বাদ দিয়ে বাচ্চার দেখভাল করছে সে, তবু কুলিয়ে উঠতে পারছে না। খাওয়াও, ঘুম পাড়াও, বেড়াতে নিয়ে যাও, অসুখ বিসুখ ত লেগেই আছে, যার চিকিৎসা ও নাই। ডাক্তার হাসিমুখে বলবে ইটস জাস্ট এ ফ্লু। গিভ হিম রেস্ট এন্ড ফ্লুইড। যেন বললেই ফ্লুইড খেয়ে রেস্ট নিয়ে নেবে তামিম। ঘ্যানঘ্যান করে অতিষ্ঠ করে ফেলবে, দুই চামচ খেয়ে ৫ চামচ বমি করবে। এবার বমি মাখা কাপড় ধোও, ফ্লোর ক্লিন কর।

তপতির কোথাও পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। কই পালাবে সে এখনো ঠিক করতে পারে না। দেশে যেতে ইচ্ছে করে খুব। হেলেন রিটায়ার করেছেন ম্যানেজার হয়ে। খুলনায় বাড়ি করেছেন। বাবা মারা গেছেন ৫ বছর আগে, একাই থাকেন, তপতির বড় বোন চিটাগং থাকে। বছরে একবার আসে। তপতিকে খুব বলেন হেলেন, দেশে আয়। এখনো রাধতে বাড়তে পারি, এরপর বুড়ো হয়ে অকর্মা হয়ে যাব, তখন ত আরো আসবি না। দুবছর আগে একবার দেশে গেছিল, দেড়মাসের জন্য। তামিম ডায়রিয়া বাধিয়ে ১ সপ্তাহ হাসপাতালে ছিল, রাজিব বিরক্ত হয়ে ১৫ দিনেই চলে এল।

তবু দেশে যেতে ইচ্ছে করে তপতির। কেন করে, বুঝতে পারে না। দেশের খাবারে ফরমালিন, রাস্তায় বাস মানুষ চাপা দিয়ে দেয়, ছিনতাই হয় যখনতখন। তবু দেশে যেতে ইচ্ছে হয়। না যেতে পেরে বাচ্চার প্রাম ঠেলে ট্রেনে উঠে পরে তপতি। উন্নত দেশের পরিচ্ছন্ন সমুদ্র সৈকত, ঝকঝকে সবুজ পার্কে মুখ ব্যাদান করে বসে আংগুরির কথা ভাবে। আংগুরিরা খুব গরীব ছিল, খেতে পেত না ঠিকমত। এক টা জামা পরে তাদের বাড়ি এসেছিল, সেই জামা বুয়াদাদী নিয়ে গেছিল কিছুদিন পর। আংগুরি পালিয়ে যাবার পর সবাই খুব বলাবলি করছিল কেন সেই অভাবের সংসারে ফিরে গেল, বুদ্ধি লোপ পেল নাকি।

রাজিবের ধারণা তপতির ও বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, বিদেশের স্বামী সন্তান সংসার ফেলে দেশে যাবার শখ হয়েছে। তাদের ৫ বছরের সংসারে তারা নিজের অজান্তেই নিজেদের কে ছাচে আটকে ফেলেছে। তপতি অর্থনৈতিক ভাবে , রাজিব রান্নাখাওয়া, ঘরকন্নার জন্য একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

তবু তপতির মন পেতে রাজিব একদিন তাকে ডায়মণ্ড রিং কিনে দিল। খুশি হতে গিয়েও হাসিটা বিশ্রী ভাবে তপতির মুখে এক পাশে ঝুলে রইল। রাজিব রেগে অস্থির হয়ে ঝগড়া শুরু করল। তপতি ডায়মণ্ডের আংটি হাতে নিয়ে মাথা নিচু করে শুনতে লাগল, সে বউ হিসেবে কতখানি ব্যর্থ আর কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে লাগল, হে খোদা, এই দেশে যাওয়ার জন্য মন কেমন করা থেকে আমাকে রক্ষা কর। আমি যেভাবে আছি, সেভাবেই ভাল থাকতে চাই।

পুর্ণিমায়

এই মাত্র মাগরেবের আযান দিল। বুড়িগঙ্গার ধার ঘেষে ছোট চায়ের দোকান টার সামনে রিক্সা থামাল রিফাত। কাধের ব্যাগ সামলে নিচে নেমে ভাড়া মিটিয়ে চায়ের দোকানে গিয়ে বসল সে।

এক কাপ চায়ের অর্ডার দিল। চায়ের সাথে কিছু খেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু দোকানে তেমন কিছু নেই। বনরুটি, হলুদ কেক এবং সাগর কলা আছে। এইসব খাবার মত দুর্দিন তার পরে নি।

সাথের ব্যাগ টাকে কাছ ছাড়া করছে না সে। কোলে নিয়েই চা খাচ্ছে। চায়ের দোকানী সন্দেহের দৃষ্টি তে তাকাচ্ছে।

রিফাতের হাসি পেয়ে গেল। সে বন্ধুসুলভ গলায় বললো, কি দেখেন, মামা?

ধরা পরে লাজুক হাসি দিল, মুসা মিয়া। কিছু না, ভাই।

দোকানে তেমন ভীর নেই। বারবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছে রিফাত, চাঁদ উঠে নি এখনো। ব্যাগ খুলে জিনিসপত্র বের করা শুরু করল সে। মুসা মিয়া হাফ ছেড়ে বাচল, ওহ, ক্যাম্রাওয়ালা। ডিসলার না কি জানি কয় এগুলারে। মুসার

মোবাইলেও ক্যামেরা আছে। ৫০০০ টাকা দিয়ে কিনেছে। ডিসলার দিয়েও যা, তার মোবাইল এও তা। তবু ডিসলারের ছবি কেমন ওঠে কে জানে। ছেলেটাকে জিগেস করা যায়।

- ভাইজান?

- বলেন।

- এই ক্যামরা দিয়ে ফটু উঠাইলে কি অয়?

- তেমন কিছু না, একটু ভাল হয়।

- মোবাইলে তুল্লেও ত হয়।

- তা হয়।

- ভাই যদি কিছু মনে না লন, একটা ছবি দেখতাম।

রিফাত হেসে ফেলল। মুসাকে ভাল লাগছে তার। চায়ের দোকানী রা এমনিতেও মাই ডিয়ার টাইপ লোক হয়। চায়ের দোকান হচ্ছে আদর্শ কমুনিজমের উদাহরণ, সাধ্যের মধ্যে প্রাপ্যবস্তু , ক্রেতার ভেদাভেদ কম। ছবির জন্যে এমনিতেও লেন্স এডজাস্ট করতে হবে। রিফাত চুলা আর কেটলির দিকে ক্যামেরা তাক করল। আবার ফোকাস সরিয়ে মুসা কে বললো, মামা, কয়েক টা কাচের কাপে লিকার ঢালেন। তারপর কেটলি চুলায় দেন। মুসা নির্দেশ পালন করল।

রিফাত কয়েক টা স্ন্যাপ নিল। এরপর মুসা কে দেখাল।
মুসা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ছবিতে কেটলির ধোয়া দেখা যাচ্ছে। তার কাচের কাপ গুলি তে লিকারের রঙ এত সুন্দর ফুটে উঠেছে, মুসা ক্ষীণগলায় বললো, ভাইসাব, এই ক্যামরার দাম কত?

- কেন? ছবি বেশি ভাল লেগেছে?

- আমার এক মেয়ে আছে, ৫ মাস বয়স আর ছেলে ২ বছরের, তারার ছবি তুলতাম।

- আছে, অনেক রকমের। ৩০ থেকে ৫০ হাজার।

মুসা মুখ কালো করে ফেলে। মায়া লাগে রিফাতের। সে গলা নামিয়ে বলে চোরাবাজারে ৫-১০ হাজারে পাওয়া যায়। খোঁজখবর করতে হয়, আমি জানামুনে আপ্পেরে।

মুসা খুশি হয়। আচ্ছা, ভাইজান।

মুসার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ক্যামেরা হাতে নিয়ে হাটা শুরু করে রিফাত। সামনে একটা চড়ার মত আছে, সেখানেই ছবি তুলবে। আজ পুর্ণিমা। নদীর পানিতে চাঁদের রিফ্লেশন ধরতে চেষ্টা করবে সে।

চাঁদ এখন মাঝ আকাশে। গয়নায় জড়ানো অহংকারী রাজকন্যার মত মাথার উপর চাঁদ হাসছে। ঝকঝক করছে, চারপাশ। লেন্স ঠিক করে ফোকাস করল সে, লেন্স ঘুরাচ্ছে, ক্লিক করার আগ মুহুর্তে এক মহিলা এসে ফ্রেমে ঢুকে গেল।

বিরক্তিতে কপাল কুঁচকে গেল রিফাতের। এই ঘনবসতিপূর্ণ দেশে মনমত ছবি তোলার সুযোগ পাওয়াও মুশকিল। যেখানেই যাও, গিজগিজ করছে মানুষ। রিফাত অপেক্ষা করতে লাগল, মহিলা হয়ত চলে যাবে।

এ কি, মহিলা দেখা যাচ্ছে মহানন্দে নদীর পাড়ে হাটাহাটি করছে। হাত বাড়িয়ে কি যেন ধরতে চাইছে, পাগল নাকি?

আবার লেন্স জুম করল রিফাত। অদ্ভুত দৃশ্য। তারই কাছাকাছি বয়সের একটা হিজাব পরা মেয়ে, চাদের আলো ধরতে চাইছে। ঠোট নড়ছে, গান গাইছে

মনে হয়। রিফাতের ভারি আফসোস হল, মেয়েটা শাড়ি পরে চুল খুলে এলে চমৎকার একটা সাব্জেক্ট হত।

ধুর, ফটোগ্রাফারের আবার বাছবিচার কিসের। সে ছবি তুলতে লাগল। তবে, ফ্ল্যাশ টের পেয়ে মেয়েটা দাঁড়িয়ে গেল। ভীত ভঙ্গী তে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। তারপর হঠাৎ দ্রুত হাটা শুরু করল।

এই মুহূর্তে মেয়েটা কন্সটেবল শিকদার আর জিলানীর সামনে পরে গেল। রিফাত সেখানেই থাকুক, আমরা নাজিয়ার কাছে যাই।

এই মহিলা, দাঁড়ান।

- কি চাই?

- আমরা কিছু চাই না। আপনি এই রাতে এখানে কি চান?

- পুর্ণিমা দেখতে এসেছি।

জিলানী হতভম্ব হয়ে গেল, পুলিশ জীবনে এমন অদ্ভুত কথা সে কখনো শুনে নাই। একটা সোমত্ত মেয়ে দেশের এই অদ্ভুত পরিস্থিতি তে রাত ৯ টায় চাঁদ দেখতে নদীর পারে আসতে পারে। নিশ্চয় এর মধ্যে কোন দুই নম্বরি আছে। শিকদার এরমধ্যে ধমকে উঠল, ফাইজলামি করেন? কি করতে আসছেন, ঠিক করে বলেন। নয়ত মহিলা পুলিশ ডেকে লকাপে নিয়ে যাব।

- কেন, এমন কোন আইন আছে রাতে চাঁদ দেখতে আসা যাবে না?

- এইখানে কি ভাড়া খাটতে আসছ তুমি? এদিকে ত খদ্দের ও পাওয়া যাবে না।

- মুখ সামলে কথা বলুন। বেয়াদব, স্টুপিড কোথাকার। আরেকবার একটা বাজে কথা বললে সুমন ভাইকে কল দিব।

- তুই চুপ। তোদের চিনা আছে, করে ছিনালী, আবার হিজাব লাগাইছে। ঠিক করে বল, তুই কার আন্ডারে কাজ করস? জামাল নাকি মোক্তার?

নাজিয়ার মেজাজ আকাশে উঠে গেল, ঠান্ডা গলায় বললো, আরেকটা বাজে কথা বললে এক ঘুষিতে দাঁত ফেলে দেব। চোর ডাকাত ধরার নামে নেই, আছে শুধু পাবলিকদের হ্যারাস করার তালে। সে খট করে মোবাইল বের করে এস আই সুমনের নম্বর ডায়াল করল। সুমন তার ফেসবুক ফ্রেন্ড।

সব শুনে সুমন ও ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেছে। হ্যা, সে মেয়েদের আত্নরক্ষা, স্বাধীনতা নিয়ে ফেসবুকে লিখে, নম্বর ও দিয়েছে কয়জন কে। সেই ভরসায় কেউ একা একা পুর্ণিমা দেখতে চলে যাবে, এ তার কল্পনার বাইরে ছিল।

সে নাজিয়ার ফোনেই শিকদার আর জিলানির সাথে কথা বললো, তারা নাজিয়ার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা পুর্বক দেশের পরিস্থিতি জানিয়ে, মেইন রোডে এসে রিক্সায় তুলে দিল। নাজিয়া দেশের নারীদের নাগরিক অধিকার নিয়ে গজরগজর করতে লাগল। দুই পুলিশ পাগলের প্রলাপ বলে ধৈর্য ধরে চুপ রইল।

রিফাত অবশ্য এসব কিছু বুঝতে পারে নি। চাদের আলোয় সে নাজিয়ার চেহারা বুঝতে পারে নি, তাই কৌতুহলে দূর থেকে তাদের অনুসরণ করেছিল। রিক্সায় নাজিয়াকে এক ঝলক দেখল সে। একটু হতাশ ই হল। কোন আধুনিক, পরিপাটি সুদর্শনা নয়। নিতান্তই সাদামাটা একজন মেয়ে। শুধু চিবুকের কাছে একটা বড় তিল। মেয়েটাকে হাসলে কেমন দেখায় কে জানে। এখন বড্ড রেগে আছে।

আজ আর ছবি তুলতে ইচ্ছে করছে না। ক্যামেরা গুটিয়ে ব্যাগে ভরে ফেল্ল সে। রিক্সা নিয়ে গুলিস্তান রওনা হল, গন্তব্য ঝিগাতলা। বাসায় আম্মা বকবে,

দেরি করলে। ছিনতাইকারী ক্যামেরা নিয়ে যাবে, যাবার সময় দুই পোচ দিয়ে যাবে, এই জন্যে রাতে ছবিই তুলতে দিতে চায় না।

পরের কিছুদিন আর কিছুতে মন বসে না রিফাতের। চিবুকে তিলওয়ালা সেই সাদামাটা বাস্তবজ্ঞানহীন মেয়েটার কথা খুব মনে হতে থাকে রিফাতের। ইচ্ছে হয়, কোন এক পুর্ণিমার রাতে নদীর ধারে দুজন মিলে ছুটাছুটি করে মুঠিমুঠি চাঁদের আলো ধরে।

নাজিয়াও চাঁদ দেখলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সে হিমালয়, কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে চায় নি। জনাকীর্ণ ঢাকা শহরের নদীর ধারে সামান্য পুর্ণিমা দেখতে চেয়েছিল। যে শুনে সেই অবাক হয়, নাজিয়া কি অদ্ভুত। এই শহরে পুর্ণিমা দেখার ইচ্ছে আর সকলেরই মরে গেছে।

প্রায় তিন মাস পর, রিফাত তার অফিসের কাজে সদর এসেছিল। হঠাৎ একটা মেয়েকে ছুটে আসতে দেখল তার পাশের দোকানে, মেয়েটি এসেই একটি বয়স্ক লোককে ধমকাতে শুরু করলো। বলল এই মিয়া, ছাড়েন বাচ্চাটাকে, এখনই ছাড়েন।

বয়স্ক লোকটির নাম মতলব মিয়া, সে উল্টা মেজাজ দেখিয়ে বলল কেন ছাড়বো, এটা আমার নাতিন।

মেয়েটি আরো রেগে গেল বলল আপনি যে একটা chilid abuser বিষয়টা জানেন? এ বাচ্চাটাকে এরকম বিশ্রী ভাবে আদর করছেন কেন?

মতলব মিয়া child abused কি জানেনা তবে বুঝতে পারল তাকে ইংরেজিতে গালি দেয়া হয়েছে, সে খুবই রেগে গেল। ক্ষিপ্ত হয়ে পরলো আপনি আমারে ইংলিশে গালি দিলেন? বেয়াদপ মেয়ে, বাপ মা আদবকায়দা শিখায় নাই?

- চুপ হারামি। বাচ্চাদের নির্যাতন করে আবার আমাকে আদবকায়দা শেখাতে আসছে।

এই সময় বাচ্চা টা ভয়ে ভয়ে সরে দাঁড়ায়। বলে, নানা আপ্নের এরুম হাতাহাতি আমার ভাল্লাগে না।

মতলব মিয়া বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে চোখ পাকায়, আর একটা কথা কইলে তোর মা সহ লাথি দিয়া ঘরতে বাইর কইরা দিমু। সারাদিন থাকব গারমেন্টে, এই আপদ থুইয়া যাইব আমার ঘাড়ে।

নাজিয়া মোবাইল বের করে ছবি তুলে ফেলে। এই ছবি আমি থানায় জমা দিয়ে আসব, রেডি থাইকেন পুলিশের জন্যে।

মতলব দৌড়ে এসে মোবাইল ছিনিয়ে নিতে চায়, নাজিয়া চেচিয়ে উঠে ছিনতাইকারী, ফোন নিয়ে গেল। এই বলে এক দৌড়ে একটা রিক্সায় উঠে বলে মামা টান দেন।

রাস্তার ওপারে বাসের অপেক্ষায় থাকা রিফাত মাথা নাড়ে, এই পাগলীর সাথে জীবন কাটাতে গেলে এইসব ঝামেলায় প্রতিদিন পরতে হবে, কিন্তু জীবন হবে অসাধারণ। একে অবশ্যই খুজে বের করতে হবে।

অধিকার

আজ শুক্রবার। শান্তা আর রাশেদ বাইরে যাচ্ছে। শান্তা আহলাদের সাথে সাজগোজ করছে। রাশেদ একটা নতুন শার্ট আর সেন্ট মেখে রেডি হয়ে বসে টিভি দেখছে। ওদের বিয়ে হয়েছে কিছুদিন আগে। এখন আত্নীয়, বন্ধু, কলিগ, শশুরবাড়ি তে ঘনঘন দাওয়াত হয়। সেখানেই যায়। নিজেদের আত্নীয়স্বজন হলে, রেজিয়া বেগম আর মুন্নি কে নিয়ে যায়, যদি আত্নীয় মনে করে রেজিয়া বেগম কে দাওয়াত দেয় আর কি। নয়ত শান্তা আর রাশেদ ই যায়। রেজিয়া বেগম খেয়াল করে দেখেছেন, শান্তা আর রাশেদ তাদের না নিতে হলেই বেশি খুশি হয়। সেদিন দুজনের আনন্দ উথলে পরতে থাকে।

রাশেদের মা রেজিয়া বেগম ছেলের সাথে এসে টিভি দেখতে বসলেন, রাশেদ মুন্নি কে ডাক দিল, মুন্নি এক কাপ চা দিয়ে যা ত। মুন্নি মোবাইল ফোন দেখছিল, মুখ ভেংচে বললো, ভাবিকে বল গে, আমি এখন সি আই ডি দেখব।

রাশেদ বিরক্ত হয়ে বললো, একটা কাজ করতে বললে কোনদিন করবে না, সারাদিন আছে টিভি আর ফেসবুক নিয়ে। পড়তেও ত দেখি না তোকে।

- তোর যন্ত্রণায় একটু টিভি দেখার ও উপায় নাই। দেখলেই খালি কাজের অর্ডার দিবে। বিয়ে করেছিস, তোর দায়িত্ব এখন ভাবির। আমি কেন চা বানাব? শান্তার রেডি হতে এমনিতেই দেরি হচ্ছে, আবার চা চাইলে আরও আধাঘন্টা লাগাবে সেটা বানাতে। রাশেদের খুবই বিরক্ত লাগে মুন্নির উপর। শান্তার দুয়েক বছরের ছোটই হবে মুন্নি, অথচ কোন কাজ করতে চায় না। মা যে কি চিজ বানাচ্ছে মেয়েকে, বিয়ে দিলে কি করবে এই মেয়ে। রাশেদ মা কে বললো, আম্মু এক কাপ চা দাও ত। শান্তার মামার বাড়িতে চা দেয় কি না কে জানে।

রেজিয়া বেগমের ইচ্ছা হল, ছেলে কে কষে এক ধমক লাগান। এক সপ্তাহ হয় বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যেই জরু কা গোলাম হয়ে গেছে। ছেলে চায়, সে সারা দিন বউ নিয়ে আহলাদ করবে আর মা বোন, সবাই মিলে তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে। অথচ এই ছেলের জন্মের পর তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন, ছেলের স্কুল, কোচিং এসব সামাল দিতে গিয়ে বাপের বাড়ি যেতে পারেন নি বছরের পর বছর। রাশেদের বাবা আহসান উল্লাহ ও তেমন যেত না গ্রামের বাড়ি। গ্রাম থেকে শশুড় শাশুড়ী, ননদ দেবর রা এলেও বেশি খাতির যত্ন করতে পারতেন না। সন্তানের যত্ন আত্তিতে যাতে কোন আপোষ করতে তার মন সায় দিত না। বরঞ্চ, তারা কি খাবে, কই থাকবে এসব দুশ্চিন্তায় কপাল কুচকে থাকত সবসময়ে। বছরকতক এ নিয়ে মনোমালিন্যর পর যোগাযোগ কমে গেল একেবারেই। রেজিয়া বেগম শান্তিমত সংসার করতে লাগলেন। একেবারে সন্তান অন্তপ্রাণ মা তিনি। সবাই খুব প্রশংসা করত তার, মা হলে ত এমনই হতে হয়,

বাচ্চাদের নিয়ে সদাব্যস্ত। এত যত্ন নিয়েছেন, ইউনিতে যাবার আগ পর্যন্ত ভাত খাইয়ে দিয়েছেন। স্কুলের ব্যাগ গুছিয়ে, টিফিন রেডি করেছেন। জামাকাপড়, বিছানা গোজগাছ কিছুই করতে দেন নি। রাশেদ মুন্নির বন্ধুবান্ধব সবসময় ঈর্ষা করত, ইশ তাদের মা যদি এমন হত।

এমনকি আহসান উল্লাহর দিকেও তেমন মনোযোগ দিতে পারেন নি, ভদ্রলোক এম্নিতেই রেজিয়া বেগমের বছর সতেরর বড় ছিলেন। ১০ বছর আগে প্রেসার ডায়বেটিস একসাথে ধরা পরে। এরপর নিজেই ডাক্তারের কাছে যেত, কি ওষূধপত্র খেত কে জানে একদিন স্ট্রোক করে মাসখানেক যন্ত্রণা সয়ে সবাই কে মুক্তি দিল। বিছানাতে পেশাব পায়খানা সব নিজেই পরিষ্কার করেছেন, কাজের লোক ছিল দুইজন, ছেলেমেয়েদের দুরেই রেখেছেন এসব থেকে। আহসান উল্লাহর ঘরে রোগির গায়ের বিশ্রী গন্ধ, মুন্নি রাশেদ এখানে তেমন একটা আসত না। তারা মায়ের সন্তান ছিল, বাপ তাদের কাছে বাইরের লোকের মত। ঘরে আসত, খেত, খরচ যোগাত। সব আব্দার মায়ের কাছেই। বাপের দরকার কি?

মরার পর অবশ্য লোকটার দরকার বোঝা যাচ্ছিল। তবুও যা হোক, ফ্লাট টা করে গেছিল, আর রাশেদের ও চাকরি হয়ে গেছিল। তাই একেবারে ভেসে যেতে হয় নি তাদের।

চা বানাতে বানাতে রেজিয়া ভাবছিলেন, আচ্ছা, এতদিন যা করছিলেন তাতে কি কোন ভুল ছিল? তার সন্তানেরা কি তাকে আসলে ভালবাসে? না কি শুধু ব্যবহার করে গেছে তারা বড় হওয়া পর্যন্ত? রাঁধতে বাড়তে পারছেন বলে শান্তা আর রাশেদ এখনো কিছু বলছে না। যখন পারবেন না তখন কি শান্তা তাকে রেঁধে খাওয়াবে?

অথবা আহসান উল্লাহর মত অসুস্থ হয়ে গেলে? তারা কি তাকে দেখাশোনা করতে পারবে? না কি বৃদ্ধাশ্রমে ফেলে আসবে? অসুস্থ লোকজন চিরকাল ই এড়িয়ে চলেছেন তিনি। মুন্নি বা রাশেদ কে ও তাদের কাছে ঘেষতে দেন নি। ওরাও কি তাই করবে?

যতদিন মাথায় বুড়োমি চাপে নি, বুড়ো হলে কি করবেন সেটা আর ভেবে দেখেন নি। এখন বুড়ো হয়ে খুব ভয় লাগছে, তিনি যৌবনে যা ভেবেছেন সন্তানেরাও যদি তাই ভাবে? না, না তিনি বাংলা সিনেমার ভিলেন বউ ছিলেন না কখনো, কিন্তু, কিন্তু --

মা, চা হলো? এতক্ষণ লাগে এক কাপ চা হতে?

- হচ্ছে, হচ্ছে। রেজিয়ার চোখে পানি এসে যায়, ছেলে এমন ভাবে হুকুম করছে যেন তিনি তার চাকর। দুইদিন পর ছেলের বউ হুকুম করবে। চোখের পানি মুছে চায়ে দুধ, চিনি মেশান তিনি। কাপ, পিরিচ গুছিয়ে চা ঢালেন। দীর্ঘদিনের অভ্যাস, ভুল হয় না একটুও।

অথচ শান্তা এক কাপ চা বানাতে গেলে এটা ওটা ফেলে ছড়িয়ে পুরো পাকঘর নোংরা করে ফেলবে, আনাড়ি মেয়ে একটা। শাশুড়ী হওয়া যে কি যন্ত্রণা, এতদিনের সাজানো গোছানো সংসারে আনাড়ি একজন এসে জুড়ে বসবে, কাজকর্মের কোন ছিরিছাঁদ নেই, তাকে কিছু বললেই তুমি খারাপ। গাল ফুলিয়ে, কেঁদে কেটে স্বামীর কাছে বলবে। পেটের ছেলের কাছে মাকে ডাইনি বানিয়ে ছাড়বে। অথচ তিনি ভেবেছিলেন, ঘরে বউ এলে এই ঘরের কাজ থেকে অবসর পাবেন। গত ত্রিশ বছর ধরে এই সংসারের সব ঠিক রাখতে গিয়ে কোন দিকে তাকানো হয় নাই, কপাল আর কাকে বলে। এতদিন নিজে কাজ করেছেন, এখন

আরেকজন কে কাজ শেখাবেন, যার কাজ শেখার দিকে কোন মন নাই। প্রায়ই দেখেন, রাশেদ বাড়ি না থাকলে মুখ ব্যাজার করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবে, আম্মু আর জাহিনের কথা খুব মনে পরছে। এরকম করলে বিয়ের দরকার ছিল কি বাপু, বাপের বাড়িই থাকতে। আইবুড়ো মেয়ের কত আদর, সে একেবারে কড়ায়গণ্ডায় বুঝে যেতে।

টেবিলে চা দিয়ে রাশেদ কে ডাকেন তিনি। রাশেদ ধীরেসুস্থে এসে বসে। চায়ের কাপ হাতে নিতেই শান্তা ভ্যানিটিব্যাগ হাতে বাইরে এসে তাড়া দেয়, এই তাড়াতাড়ি চল, মামী তিন বার কল দিয়েছে, পরে বলবে তুমি লেট লতিফ। চায়ে এক চুমুক দিতে গিয়ে জিহবা পুড়িয়ে ফেলে রাশেদ, এহ, এত্ত গরম। থাক, এই চা খেতে গেলে আরো আধাঘন্টা লাগবে, সিএনজি কতক্ষণে পাই কে জানে। আসি আম্মু, , বলে বের হয়ে যায় সে আর শান্তা । শান্তা একবার কিছু বলেও গেল না, রেজিয়া মনে মনে বলেন বেয়াদব একটা, এত বাছাবাছি করে এই মেয়েকে ছেলের বউ করেছেন তিনি।

পরিত্যক্ত এক কাপ গরম চায়ের দিকে অভিমানে চোখের পানি এল রেজিয়া বেগমের। ছেলের বিয়ে দেয়া যে এত কষ্টের, এটা কে জানত? হঠাৎ আহসান উল্লার কথা খুব মনে হয় তার। লোকটা থাকলে এত কষ্ট লাগত না হয়ত। চোখ দিয়ে পানি পরতে থাকে তার। মুন্নি ডাইনিং টেবিলে এসে দেখে রেজিয়া বেগম কাঁদছেন, একটু অন্যমনস্ক গলায় বললো, ভাইয়া কেমন পালটে গেছে, তাই না মা? রেজিয়া বেগম হু হু করে কেঁদে ফেলেন।

ওদিকে সিএনজির জন্য অপেক্ষা করতে করতে শান্তা ভাবছিল, সে আর রাশেদ বাইরে যেতে গেলে তার ননদ আর শাশুড়ী কেমন অদ্ভুত আচরণ করেন।

তাদের নতুন বিয়ে হয়েছে, হানিমুন পিরিয়ড এ দুজনের একটু একান্ত সময় কাটাতে খুবই ভাল লাগে। ননদ শাশুড়ির সামনে স্বামী নিয়ে আহলাদ করা যায়? রাশেদ আর তার একটা আলাদা সংসার হলে মন্দ হত না। সমস্ত পিছুটান ফেলে তারা কেবল দুইজন।

- এই যে ম্যাডাম, কি ভাবছেন? রাশেদের কথায় চমকে উঠে শান্তা।

- নাহ, কিছু না। উবার ডাকা যায় না? এই রাতের বেলা সেজেগুজে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে কেমন লাগছে বল ত?

- ভালই ত লাগছে। সুন্দরী, নতুন বউ, লোকে দেখুক আমার বউ আছে। অনেক ডাক্তার, প্রবাসী, বিসিএস ক্যাডারের সাথে যুদ্ধ করে পাওয়া বউ।

শান্তা ম্লান হাসে, বাড়ি ফিরলেই আবার মা বোন কে দেখে আড়ষ্ট হয়ে যাবে লোক টা। এখন এমন ভাব করছে যেন সে বউপাগল স্বামী। সবসময় কেন এমন থাকে না?

রাশেদ আর কথা না বাড়িয়ে ফোনে উবার কল করতে থাকে। বিয়ের পরপর ই তার মা, বোন, বউ সবাই তার সাথে কেমন উদ্ভট আচরণ করছে, এরা যে কি চায় আল্লাহই জানে। এদের সবার সাথে তাল মেলাতে গিয়ে হিমসিম খেতে হচ্ছে, মহিলাদের মন বোঝা বড় মুশকিল।

সংগিনী

ফুটবল খেলতে গিয়ে পায়ে ভালই চোট পেয়েছে মাওলা। অপর দলের আব্দুল হাই কথা নাই, বার্তা নাই বলে লাথি দিতে গিয়ে তার ডান উরুতে লাথি মেরে দিয়েছে। ভালই হয়েছিল, ফ্রি-কিকে গোল দিয়ে ফেলেছে মাওলা। আন্তঃজেলা ফুটবল টুর্নামেন্ট জিতে গেছে তারা। কিন্তু এখন পায়ের ব্যথায় অস্থির হয়ে গেছে। তাদের কোচ দুটি ব্যাথার ট্যাবলেট খাইয়ে থাকে বাড়ি পাঠিয়েছেন, আগামী এক সপ্তাহ বিশ্রাম।

কাপ এবং মেডেল সহকারে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরে ঢুকলো মাওলা। তার বাবা মীর মাহমুদুল হাসান তালুকদার বিটিভিতে সন্ধ্যা আটটার খবরের জন্য বসার ঘরে অপেক্ষা করছেন। টিভিতে চলছে কৃষি অনুষ্ঠান মাটি ও মানুষ। সময় আশির দশক, যে সময়ে খেলাধুলা, আউট বই পড়া, সিনেমা দেখা এসব ছিল

পরিবারের কুসন্তান এর লক্ষণ। বই পড়া বাদে আর সব লক্ষণই মাওলার স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত, সে ফুটবল টিমের স্ট্রাইকার, হিন্দি সিনেমা বিশারদ।

টিভি সিনেমার নায়কের স্টাইল ফলো করে সে, অমিতাভ বচ্চনের প্রতিটি মুভি প্রায় 10 বার করে দেখা। তবে উচ্চশিক্ষিত বলতে যা বোঝায় সে তা নয়। সেই আশির দশকে মেট্রিক পাশ মানে প্রায় উচ্চশিক্ষিত। সেই স্কুল পাস দিতেই একেকজনের ঘাম ছুটে যেত। সেই হিসাব করলে মাওলা এইচ এস সি পাশ, উচ্চশিক্ষিত ই । করবে বাপের ব্যবসা, অত পড়ার দরকার কি?

বসার ঘরে তালুকদার সাহেব কে দেখে মাওলার ইচ্ছা হয় কাপ মেডেল সব বাইরে ফেলে দেয়। এতক্ষণ পাড়া সুদ্ধ লোক তাকে মাথায় করে নেচেছে। পাড়ার ক্লাস সিক্স পড়ুয়া স্কুলের মেয়ে থেকে নতুন ভাবি বৌ সবাই উঁকি দিয়ে তাকে দেখেছে আর এখন বাপের সামনে ঘরে ঢুকতে হচ্ছে দাগী আসামীর মত।

মোটামুটি নিঃশব্দে ঘরে ঢুকতে গিয়ে পেছন থেকে ডাক শুনতে পেলে মাওলা,

‘ কে যায়, বাংলার ম্যারাডোনার নাকি? ‘

হঠাৎ মাওলার গলা ছাতি সব শুকিয়ে গেল, কেউ যদি এক গ্লাস পানি তো খুব ভালো হতো। কিছু বলতে গিয়ে কথা গলায় আটকে গিয়ে খুক খুক করে কাশতে থাকে সে। তালুকদার সাহেবের ইচ্ছা ছিল ছেলে কে দুটো ভালো কথা বলেন। ম্যাচ জেতায় পাড়ার সকলেই খুব খুশি হয়েছে, আজ মসজিদেও অনেকে বলছিল, অথচ এ ভয়েই অস্থির। এদিকে বাবাকে ভয় পায় আবার বাবার কথা শোনে না, কি যে সব হয়েছে আজকালকার ছেলে পেলে।

‘যাও ভেতরে গিয়ে রাতের খাবার দিতে বল ‘ মাওলা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। গোসল সেরে, চুল আচড়ে, লুঙ্গি পড়ে তোষকের নিচ থেকে সন্তর্পনে চিত্রালী

বিনোদন পত্রিকা বের করল সে। বাসস্ট্যান্ড থেকে প্রতি মাসে সে এক কপি চিত্রালী কিনে আনে সে। সেটিও সবার সামনে পড়া বেয়াদবি, তাই বিছানার নিচেই থাকে। পত্রিকা খুলে তার মন ভালো হয়ে যায়, মুম্বাইয়ের রেখা কে নিয়ে ফিচার হয়েছে 'মিস্টার নটোয়ারিলাল হিটঃ বোম্বের নায়িকাদের শীর্ষে এখন রেখা ' সাথে পাহাড়ি মেয়ের পোশাকের সাদাকালো ছবি। মিস্টার নটয়ারিলাল এখনো দেখা হয়নি মাওলার। বই (ভিডিও ক্যাসেট) আসতে নাকি আরও মাস খানেক লাগবে। তার ইচ্ছা হয় রেখাকে বিয়ে করে, এতোই ভক্ত সে রেখার। এমন না রেখা খুব সুন্দরী, সমসাময়িক হেমা মালিনী তার চেয়ে সুন্দর, দুধে আলতা গায়ের রং, আঁকা ছবির মতো চেহারা। কিন্তু রেখার সেই দুষ্টু মিষ্টি চাহনি আর হাসি তে সব এলোমেলো হয়ে যায় মাওলার। পাড়ার যুবরাজ হিসেবে তার প্রেমিকার অভাব হওয়ার কথা না কিন্তু তার মন আটকে আছে রেখার মতো মিষ্টি শ্যামলা চেহারার কারুর স্বপ্নে, সেরকমই চাই তার।

তার পরের সপ্তাহে মাওলা কে ব্যবসার কাজে ঢাকায় পাঠালেন তালুকদারসাহেব। তিনি চাচ্ছেন মাওলা ব্যবসা বুঝে নিক। দুভাই দুটো দোকান দেখছে । মাওলার ও আপত্তি নেই, টাকা-পয়সা দরকার হয় তো পুরুষ মানুষের। একটা ভি সি আর এর শখ তার অনেকদিনের। অমিতাভ-রেখার বই গুলি সব কিনে বাসায় জমিয়ে রাখবে সে, সুযোগ মতো দেখবে।

কমলাপুর রেল স্টেশনে নেমে হাঁটতে শুরু করল সে, হঠাৎ দেখল প্রায় বছর বাইশ তেইশ বয়সের একটা মেয়ে আর একজন লোককে একগাদা কুলি ঘিরে ধরেছে। সবাই মিলে তাদের ব্যাগপত্র টানা হ্যাচরা করছে। মেয়েটা বকা ঝকা দিয়েও কুলিয়ে উঠতে পারছে না। কুলি গুলি খুব বিরক্ত করে, মাওলা

এগিয়ে গেল। এই কি হচ্ছে, একজন বাদে সব যাও, ধমকে ওঠে মাওলা। মাওলার 6 ফুট লম্বা পেটানো শরীর দেখে কুলিদের আর ঝামেলা করার সাহস হলো না। মাওলা লোকটির কাছ থেকে বিদায় নিলো, চলি তাহলে। মেয়েটি হাসলো, তারপর বললো 'দাদা তুমি কি হাঁটতে পারবে, না বেবি নিয়ে আসব কাছে? '

পেছনে ফিরে তাকাল মাওলা। লোকটি তাহলে মেয়েটির ভাই। শ্যামলা ছিপছিপে সপ্রতিভ একটি মেয়ে, বেশ তো দেখতে। মাওলা ভদ্রতা করে বলল, উনি কি অসুস্থ? মেয়েটি উত্তর দিল, 'জি রিউমেটিক ফিভার. ঢাকায় ডাক্তার দেখাতে এসেছি.'

মাওলা ব্যস্ত হয়ে বলল, তাহলে আপনারা এখানে দাঁড়ান, আমি বেবি নিয়ে আসি কাছে। লোকটি ইতস্ততঃ করল, অসুবিধা নেই , আমরা পারবো। আপনাকে কষ্ট দিতে চাইনা। মাওলা বলল, ব্যাপার না, এক্ষুনি আসছি আপনারা কোথায় যাবেন?

লোকটি বলল পিজি হাসপাতাল।

বেবি তে ওঠার পর মেয়েটি জিজ্ঞেস করল আপনি কোথায় যাবেন? চলুন নামিয়ে দিয়ে যাই। মাওলা বলল, নাহ আপনারা যান, আমার কাজ পুরান ঢাকায়। বাস ধরব সামনে থেকে।

সেই আমলের টু স্ট্রোক ইঞ্জিন এর বেবি ট্যাক্সি বিকট শব্দে স্টার্ট নিল। মেয়েটি হাসি মুখে কি যেন বললো, মাওলা শুনতে পেল না। উল্টা মেয়েটির হাসি দেখে তার মাথা কেমন এলোমেলো হয়ে গিয়ে বুকে ব্যথা শুরু হয়ে গেল। মেয়েটার হাসি চাওনি সবই রেখার মতো। কিছু না বুঝেই মাওলা উদভ্রান্তের

মতো দৌড় শুরু করল ট্যাকসির পিছনে, টেক্সি থামলে কি বলবে, সে চিন্তাও করা হয়ে ওঠেনি। শুধু মনে হচ্ছে সুদূর বোম্বে থেকে রেখা এসে তার সামনে ট্যাক্সি করে চলে যাচ্ছে,। এখনি যা করার করতে হবে আর নয় তো কখনোই এমন সুযোগ পাওয়া যাবে না। মেয়েটার নাম জানতে না পারলে মহা অনর্থ হয়ে যাবে।

টেক্সীওয়ালা টেক্সি থামালো, মেয়েটির সাথের ভদ্রলোক মাথা বের করে বললো কিছু বলবেন?

মাওলানা থতমত খেয়ে বলল, আমার একজন রোগী ভর্তি আছে পিজি হাসপাতালে। ভাবছি, আপনাদের সাথে গিয়ে তাকে দেখে আসি।

ভদ্রলোক অবাক হলেও কিছু বললেন না, সরে গিয়ে মাওলাকে জায়গা করে দিলেন। তখনো ঢাকার রাস্তায় অত জ্যাম ছিল না, বেবি টেক্সি ভটভট করতে করতে আধাঘন্টা তেই পি জি হাসপাতাল পৌঁছে গেল।

সবাই নামার পর মাওলাই একে তাকে জিজ্ঞেস করে মেডিসিন আউটডোর খুঁজে বের করলো। লম্বা লাইন দেখে ভদ্রলোককে বসিয়ে রেখে মেয়েটি লাইনে দাঁড়ালো। মাওলা পাশে নার্ভাস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল, কিভাবে কথা শুরু করবে বুঝতে পারছে না। মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ ভাবে বলল, আমি নিতু, আপনি?

-মাওলা। গোলাম মাওলা তালুকদার।

- আপনার রোগী কোন কেবিনে ভর্তি?

মাওলা আমতা আমতা করে, ঠিকানা টা হারিয়ে ফেলেছি, দেখি অফিসে খোঁজ করে। নিতু মুচকি হাসে, ‘ আপনার কেউ ভর্তি নেই, এমনি আমাদের সাথে এসেছেন, তাই না? ‘

ধরা পড়ে মাওলা বিব্রত ভঙ্গিতে হাসে। বোকার মত জিজ্ঞেস করে বসে,ইয়ে আপনি কি বিবাহিত?

এই প্রশ্ন শুনে নিতু কেন যেন রেগে যায়, তেতে উঠে বলে কেন? অবিবাহিত হলে বিয়ে করবেন? স্টেশনে বিশ মিনিট দেখে বিয়ে করে ফেলতে ইচ্ছে করছে?

মাওলা অসহায় বোধ করে, এই মেয়ে রাগলে আরও সুন্দর দেখায়. কেমন চোখ বড় করে, নাকের পাটা ফুলিয়ে কথা বলছে, মাওলার ইচ্ছা হলে বলে ফেলে, হ্যাঁ বিয়ে করব। কবুল, কবুল, তিন কবুল।

তা ত আর বলা যায় না, নার্ভাস ভঙ্গিতে বলে,' আপনি এত রেগে যাচ্ছেন কেন? আমি তো খারাপ কিছু জিজ্ঞেস করিনি। আপনার সাথে কথা বলছি, আপনার আপত্তি না থাকলে পরিচয় আগে বাড়বে। রেগে যাওয়ার কি হলো? '

নিতু ক্লান্ত স্বরে বলে, ' সরি আসলে এসব নিয়ে আর কথা বলতে ইচ্ছা হয় না, এত প্রস্তাব পেয়েছি আর এত প্রত্যাখ্যান করেছি, এসব শুনতে বিরক্ত লাগে।

- প্রস্তাবের ব্যাপার তো বুঝলাম, আমি প্রথম না, কিন্তু প্রত্যাখ্যান এর মানে কি?

- সংক্ষেপে, আমার বাচ্চা আছে একটা।

মাওলা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস গোপন করে নিজেকে সামলে বলে, আপনি বিবাহিত এটা বললেই হতো, আর বিরক্ত করতাম না।

-আমি বিবাহিত নই।

- তাহলে বাচ্চা?

নিতু হেসে ফেলল, ব্যস, সব মুগ্ধতা শেষ? মাওলাসাহেব, ছেলেদের চাওয়া বোঝার মত বয়স আমার হয়েছে। আজ্ঞাবহ সুন্দরী অনুগত দাসি চাই তাই তো? আমি সেরকম কেউ নই।

বাদ দিন সেসব কথা। আপনার ছবি আমি আগে দেখেছি পেপারে, ভালো ফুটবল খেলেন। একদিন আসবেন আমাদের বাসায়। আমার বাবা ফুটবলের খুব ভক্ত, খুশি হবে আপনাকে দেখলে। একটা কাগজে ঠিকানা আর ফোন নম্বর লিখে দেয় নিতু, শান্ত গলায় বলল, ভাল থাকবেন।

মাওলা ভারাক্রান্ত মনে বিদায় নিল। অবিবাহিত মেয়ে অথচ বাচ্চা আছে এর কোন গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা সে বের করতে পারলো না। যে ব্যাখ্যা বের হয়, তাতে করে কোন মেয়ে মুখ ফুটে সে কথা বলতে পারে না। অথচ নিতুকে দেখে মনে হচ্ছে এ নিয়ে তার কোনো অপরাধবোধ নেই, আশ্চর্য ব্যাপার। অবসন্ন ভঙ্গিতে পিজির বাইরে এসে দাড়ালো সে। শাহবাগ টু সদরঘাট মুড়ির টিন টাইপ একটা বাসে উঠে বসলো। কাজ শেষে বাড়ি ফিরে গোমরা মুখে দিন কাটাতে লাগলো সে। নিতুকে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। নিজেকে অনেক করে বোঝালো একটি অবিবাহিত বাচ্চা ওয়ালা মেয়ে কিছুতেই ভালো হতে পারে না কিন্তু মন সেটা কিছুতেই বুঝ মানেনা। মনের সাথে লড়াই করতে করতে সে ক্লান্ত হয়ে গেল, কিছুই ভালো লাগছে না। বিছানার নিচ থেকে চিত্রালী বের করে রেখার দিকে তাকায়। তাকাতে গিয়ে মনে হল নিতু তার দিকে তাকিয়ে বিদ্রুপের হাসি হাসছে। প্রচন্ড রাগে চিত্রালী ছিড়ে ফেলল সে। ফুটবল খেলতে গিয়ে দুইবার ফাউল করল, বিপক্ষ দল পেনাল্টি পেয়ে জিতে গেল। রাগে-দুঃখে নিতু-র অদেখা বাচ্চার বাপ কে শাপান্ত করতে লাগল, সে হারামি কোথাকার, বিয়ে করবি না তো বাচ্চা পয়দা

করতে গেলি কেন? আর সহ্য করতে না পেরে ফার্মেসি ওয়ালার দ্বারস্থ হলো সে, দুইটি সিডাকসিন খেয়ে বেলা 12 টা পর্যন্ত ঘুমিয়ে রইল। নাস্তা, রাতের ভাত অর্ধেক খেয়ে উঠে যেতে লাগল। ঘটনার জের অন্দরমহল ঘুরে তালুকদার সাহেবের কান পর্যন্ত পৌছে গেল। তালুকদার সাহেব তার শ্যালক, মাওলার ছোটমামা মেহেদি হাসান কে যে পাঠালেন মাওলার খবর জানতে। যা শুনলেন তাতে হতভম্ব হয়ে গেলেন। ঢাকায় কোন এক বাচ্চার মায়ের প্রেমে পড়ে তার গুণধর পুত্র হাবুডুবু খাচ্ছে। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন কালবিলম্ব না করে একে বিয়ে দিতে হবে, সেটি এর একমাত্র চিকিৎসা। ঘটকের ডাক পড়ল, পাত্রী দেখা শুরু হয়ে গেল।

পাত্রী দেখা চলছে ।দেশে মেয়ের আকাল কোনোকালেই ছিল না, মাওলার বিচক্ষণ মা যতই তার পছন্দ মতো ফর্সা গোলগাল, সাত চড়ে রা কাড়েনা গোছের মেয়ে খুঁজে বের করেন, পাত্রের চোখ ততই সপ্রতিভ মিষ্টি শ্যামলা নিতু কে খুঁজে ফেরে। নম্র-ভদ্র, ঘোমটা টানা জবুথবু পাত্রীর পেছনে অদৃশ্য দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসতে থাকে নিতু।

এই দোটানায় পড়ে মাওলা জ্বর বাধিয়ে ফেলে। শেষমেশ উপায় না দেখে মেহেদী মামা জিজ্ঞেস করেন ওই মেয়ের ঠিকানা আছে কিনা দে, খোঁজখবর নিয়ে আসি। উদ্দেশ্য, কথা আগে বাড়লে কোন একটা ছুতোয় মাওলার মাথা থেকে নিতুকে বের করা। সঙ্গে সঙ্গেই জ্বর গায়ে বিছানা থেকে উঠে পরল মাওলা। তার মানিব্যাগ থেকে অতি যত্ন সহকারে রাখা নিতুর ঠিকানা লেখা কাগজ বের করে দিল। দুলাভাই তালুকদার সাহেব এর অনুমতি নিয়েই মেহেদি হাসান নিতুদের বাড়ি খোঁজ করতে যান। নিতুর বাবা মাজহারুল ইসলাম ভূঁইয়া এলাকার

বনেদি পরিবারের ধনাঢ্য বড়লোক। আশেপাশের সবাই নিতুর প্রশংসাই করল। হাসিখুশি মিশুকে ভালো মেয়ে । ঢাকার ইডেন কলেজ থেকে অনার্স করে স্থানীয় কলেজে ইংলিশ পড়াচ্ছে। তবে মেয়ের অদ্ভুত নাম আছে, তুইত্যা পাগল। নামকরণের সার্থকতা হিসেবে বলা চলে, যেখানেই সে অনাথা বাচ্চা দেখে, কোলে নিয়ে বাড়ি চলে আসে। তাদের শুধু আশ্রয় দেয়া না, মাতৃস্নেহে লালন পালন করে। বিষয়টা শুনতে অতি মহৎ হলেও অবিবাহিত মেয়ের পরিবারের জন্য খুব সুখকর বিষয় না, বিয়ের ভাল ভাল সম্বন্ধ এজন্য ফিরে যায় । তবে ভূঁইয়া সাহেব মেয়েকে নিষেধ করেন না। নিতুর পিঠাপিঠি বড় ভাই মুকুল মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। ভাইয়ের শোকে নিতু অনেকদিন অসুস্থ ছিল।

এরপর এক দুস্থ মহিলা এক বাচ্চা নিয়ে ভুঁইয়া ও সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় এর জন্য উপস্থিত হয়। দুদিন পর বাচ্চাটিকে সে ফেলে পালিয়ে যায়। তারপর থেকেই নিতু বাচ্চাটিকে লালন পালন করে এবং তার মাথাও ঠিক হতে শুরু করে। এজন্যই ভূঁইয়া সাহেব কখনোই নিতুকে বাচ্চা পালতে পারবে না এ রকম বিধিনিষেধ দেন না। হিতৈষী মহল আপত্তি জানালেও ভুইয়া সাহেব জানিয়েছেন, যে বাচ্চা সহ নিতু কে বিয়ে করবে তার কাছেই মেয়ে বিয়ে দিবেন, দরকার হয় ঘরজামাই রাখবেন।

মেহেদি সাহেব, মাওলার বাবা কে সব খুলে বললেন। তখনকার দিনে বিয়েতে পয়সা বা গায়ের রং এর তুলনায় উচ্চ বংশের গ্রহণযোগ্যতা বেশি ছিল। যার তার সাথে তালুকদার সাহেবের আত্মীয়তা মানায় না, ভুইয়াবাড়ির মেয়েই বউ হয়ে আসুক। পরবর্তী ঘটনা অতি দ্রুত ঘটল, তখনকার দিনে প্রায় দশ লাখ টাকার দোকান সম্পত্তি নিতুর নামে লিখে দিলেন নিতুর বাবা। বললেন

,যৌতুক নয় ,বাচ্চা কাচ্চা পালতে দিয়েছেন । মাওলা নিতুকে পেয়ে আকাশের চাঁদ হাতে পেল। সর্বদা তাকে দন্তবিকশিত চেহারায় দেখা যেতে লাগল।

রূপকথা হলে অতঃপর তারা সুখে শান্তিতে বসবাস করত। কিন্তু বাস্তবে অবিমিশ্র সুখ বলে কিছু নেই। বই পড়তে যা মহত্ত্ব মনে হয় বাস্তবে তা নানাবিধ সন্দেহের উদ্রেক করে। এই পালক বাচ্চা আসলেই কার? তার বাবা কে ? বাড়িতে পালক বাচ্চা রেখে কলেজে কেন পড়াতে যাবে নিতু? তারই পালক বাচ্চাকে অন্যেরা দেখবে কেন দেখবে?এসব এড়াতে মা-বাবার অনুমতি নিয়েই মাওলা আলাদা বাসায় উঠল, কিন্তু নীতুর সাংসারিক জ্ঞান তেমন সুবিধার না। তার মাথায় সারাক্ষণ অন্যকে সাহায্য কিভাবে করা যায়, সে চিন্তা ঘোরে। অদ্ভুত সব কান্ড করে, একবার নিয়ে এলো প্রায় পতিতা গোছের একটি মেয়ে কে। মেয়েটি অনাথা, তার অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের সংস্থান এর কোনো উপায় নেই। মহল্লার তথাকথিত অভিভাবকদের একদল তাকে অপ্রকাশযোগ্য ব্যবহার করে তার অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করে। বাকি অভিভাবকরা মেয়েটিকে পতিতা বলে সমাজচ্যুত করতে চান। নিতু সেই মেয়েকে ধরে নিয়ে এসেছে, চার দিকে ঢিঢিক্কার পড়ে গেল। নিতুর জিদের কাছে হার মেনে আরেক শহরে চলে গেল মাওলা। মেয়েটি তার বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছিল, তার বিয়ের আগ পর্যন্ত মাওলা দের বাড়ি আগলে রেখেছিল। এর মধ্যে নিতুর নিজের আরও তিনটি ছেলে মেয়ে হয়, আরো দুটি পালক আসে। বাড়িতে সারাদিন হাফ ডজন বাচ্চার হাউকাউ এ মাওলার মাথা খারাপ হবার যোগাড় । যদিও বাচ্চাদের স্কুলের পড়া, বেড়ে ওঠা সবই হচ্ছিল চমৎকারভাবে, এই বিষয়ে নিতুর কোন রকম আপোষ নেই।

এত ঝামেলার মধ্যে নিত্য নতুন কাজের লোক আসে, তাদের সাথে বাচ্চাকাচ্চার লালন পালন নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়, নিতু-র বিশ্বাসে সুযোগ নিয়ে তারা চুরি করে পালায়। এক দুপুরে দেখা গেল বাসায় কোন চামচ নেই, কাজের মেয়েও নেই। কাজের মেয়ে সব চামচ নিয়ে পালিয়েছে। মাওলার মাঝে মাঝে খুব বিরক্ত লাগে, ইচ্ছা হয় নিতুকে বলে তোমার পরোপকার থামাবে? আমার আর ভালো লাগে না।

কিন্তু নিতু এতে এমন মনমরা চেহারা করে ঘুরে, মাওলার নিজেরই হাসফাস লাগে। থাক, করুক যা খুশি। এই বাচ্চাকাচ্চা তো চিরকাল ছোট থাকবে না, একটু বয়স হলে নিতুকে বেশ করে পাওয়া যাবে। তখন সে আর নিতু বিদেশ গিয়ে টিউলিপ বাগানে হাটাহাটি করবে, সিলসিলা ছবির মত।

দেখতে দেখতে প্রায় ৩০ বছর চলে গেল। এরশাদের আমল থেকে বিএনপি, আওয়ামী লীগের আমলে এলো। ভটভটানি কালোহলুদ বেবিট্যাক্সি থেকে সবুজ সিএনজি । ল্যান্ডলাইনের বদলে মোবাইল ফোন। নিতুর ছেলে মেয়েরা বড় হয়ে গেছে, বিয়ে হয়েছে দুজনের, একজন চলে গেছে কানাডা । নাতিপুতি নিয়ে ভরভরন্ত সংসার। এরই মধ্যে একদিন নীতু মাথা ঘুরে পড়ে যায়। হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে দেখা যায় নিতু স্ট্রোক করেছে, মাওলার বুক কাঁপতে থাকে। নিতু কি তাকে ছেড়ে চলে যাবে? এই এত বছর অদ্ভুত ব্যস্ততায় কেটে গেছে, নিতুকে ঠিক করে পাওয়াই হয়নি। নিতু পরে আছে বিছানায়, নাকে নল লাগানো, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। প্রায় এক মাস পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল নিতু। বাম হাত পা প্রায় অবশ। তার চেয়ে বেশি মন মরা নিতু। ছটফটে চড়ুই পাখির মতো মানুষ আর চলাফেরা করতে পারছে না এর চেয়ে অসহায়

দৃশ্য মনে হয় আর কিছু নেই। নিতুর বিষন্ন চেহারা দেখে মাওলার ইচ্ছে হয় জোর করে ধরে হাসায়। তার নিতু, তার দুষ্টু মিষ্টি হাসি খুশি নিতু। কি হয়ে গেল তার নিতুর।

ফিজিওথেরাপি, কাউন্সেলিং সবই চলছে। খুবই ধীরলয়ে শারীরিক উন্নতি হচ্ছে নিতুর । মাস ছয়েক পর একদিন বাড়ি ফিরে মাওলা দেখে, নিতু বেশ হাসিখুশি। তবে বাড়ির লোকজন, কাজের মেয়ে সবার মুখ ভার। মাওলা খুবই অবাক হলো, নিতু তাকে খুশি খুশি গলায় বলল, শরবত খাবে আজকে লেবু আনা হয়েছে বাসায়। মাওলা কিছু বুঝতে না পেরে বলল, কি হয়েছে নিতু?

উত্তরে ওয়া ওয়া নবজাতকের কান্না শোনা যেতে লাগলো। মাওলার নাতনি রুপন্তি খুশি খুশি গলায় বলল, দাদু আজ হাসপাতাল থেকে আরেকটা বেবি নিয়ে এসেছে। মাওলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এই ৬০ বছর বয়সে আবার বাচ্চার বাবা হওয়া, নীতু টা যে কি।

কিছু বলতে গিয়ে আবার নিতুর হাসি মুখের দিকে চোখ গেল। দীর্ঘদিন পর তার আনন্দ ঝলমলে মুখ দেখে সেই প্রথমবারের মতো আবারো মাওলার সব বিষয় বুদ্ধি লোপ পেল। থাক একটা বাচ্চাই তো, 6 টা বাচ্চা পালতে পেরেছে আর একটা পারবে না?

(গল্পের নিতু চরিত্র টি আমার পরিচিত, তাকে শব্দে বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তবুও চেষ্টা করলাম, কতগুলি অনাথ বাচ্চার জীবন যে পালটে দিতে পারে, গল্প ত তাকেই নিয়েই হতে হয়। নিতু আর মাওলা দুজনেই এখন খুব ভাল আছে, তাদের চাঁদের হাট নিয়ে)

কাঙালের ধন

স্টিলের আলমারি খুলে নীল ঢাকাই জামদানী টা বের করে বিউটি। আজ এই শাড়িটাই পরবে। নয়টায় চেম্বার শেষে ভাইয়ের বাড়িতে যাবে। আজ ভাইয়ের ছেলের মুসলমানীর দাওয়াত, সব আত্নীয় রা আসবে, ভাল কাপড় পরা দরকার। এই শাড়ি টা দিয়েছেন তার লন্ডনপ্রবাসী মেঝখালা, তাকে ছোট থেকেই খুব আদর করেন।

শাড়িটা পরে আয়নার দিকে তাকাতেই মন ভাল হয়ে গেল বিউটির। আজ সে চুলে শ্যাম্পুও দিয়েছে। একদম ডাক্তার ম্যাডামদের মত দেখাচ্ছে তাকে। ইশ, সে যদি জেসমিন ম্যাডামের মত ডাক্তার হতে পারত। কত কত টাকা ম্যাডামের। যা খুশি কিনতে পারে, তার মত সপ্তাহে এক টা ফার্মের মুরগি কিনলে বাকি দিন টাকিমাছ, চাপিলামাছ খেয়ে থাকতে হয় না। ছেলেমেয়েদের স্কুলের বেতনের

বাইরে অন্য কোন খরচের কথা শুনলে বুকে ধুকপুক শুরু হয়ে মাথা ঘোরানো শুরু হয় না।

তবু যাহোক, জেসমিন ম্যাডামের বদৌলতেই দিন চলছে তার। বিউটির স্বামী আসগর ছিল জেসমিন ম্যাডামের ক্লিনিকের ম্যানেজার। খেয়েপরে মোটামুটি ভালই চলছিল তার। এখনো যেমন অনেক চাওয়া অপুর্ণ থাকে, তখনো থাকত। কিছু চাইলেই খেকিয়ে উঠত আসগর, ভারি অভিমান হত বিউটির, লোকটা এমন কেপ্পন আর বদমেজাজি কেন ভাবত। এখন বোঝে, অল্প কটা টাকা বেতনের টাকায় আসলে কোন আলগা খরচ অসম্ভব।

তবু, তাদেরই যত খরচ এসে ধরে বসে। এই যে জেসমিন ম্যাডাম বা সালেহীন স্যার - এদের আয় হল গিয়ে মাসে ৪-৫ লাখের উপর। এদের কখনো অসুখবিসুখ হয়? হয় না, নিত্যদিন টাকশালের মেশিনের মত এত এত টাকা আয় করেই চলেছে আর আসগরের হল গিয়ে পাকস্থলীর ক্যান্সার। অরুচি অরুচি বলে এক বস্তা এন্টাসিড আর সেকলো খাবার পর এন্ডোস্কপি করে দেখে ক্যান্সার, কি চিকিৎসা করাবে, কোন ডাক্তার দেখাবে এসব বুঝে ওঠার আগেই ক্যান্সার লিভারেও ছড়িয়ে গেল। এর তার কাছে সাহায্য চেয়ে চেয়ে যোগাড় হল, প্রায় ৭৫ হাজার টাকা। তখনো রুবেল রাসেল মাত্র স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ৭৫ হাজার টাকা এক সংগে কোন দিন চোখেও দেখে নি তারা, আসগর চিকিৎসা করাতে হাসপাতালে ভর্তি হল। ডাক্তার রা কেউ তেমন আশা দিতে পারল না, এর চিকিৎসা নাই। অথচ রোগী আনা নেয়া, ওষুধ পথ্য এই করতে গিয়ে ১ সপ্তাহে ৭৫ হাজার টাকা প্রায় উড়ে গেল। বিউটি অত কিছু বুঝেও উঠতে পারে নি। ঘর

সংসারের বাইরের পৃথিবী কতখানি জটিল, তা সে কখনো কল্পনা ও করতে পারে নি।

ক্যান্সারে মানুষ দুম করে মরে যায় না, একটু একটু করে মরে আর আশেপাশের মানুষদের ও মারে। যতদিন চলাচলের ক্ষমতা ছিল, আসগর কাজ করত। ক্লিনিকে আসা সমস্ত ডাক্তার দের কাছে সাহায্য খুজত। প্রথম প্রথম সবাই বেশ সাহায্য করলেও পরবর্তীতে ৫০-১০০ এর বেশি কেউ দিত না, বরঞ্চ দেখলেই সিটিয়ে যেত ।। এরপরে শরীরে পানি এসে পেট ফুলে গেল, জন্ডিসে হলুদ হয়ে গেল সারাদেহ । বিছানায় পরে গেল সে। মানুষ টার শেষ সময়ে দরকার ছিল সেবাযত্নের, অথচ বাজার বাসাভাড়ার চিন্তায় সে নিশ্চিন্তে মরতেও পারছিল না। রুবেল রাসেলের স্কুল বন্ধ করে দিতে হল, ঘরে চাল ডাল নেই, চিকিৎসা ত দূর অস্ত। সে সময় আসগর জেসমিন ম্যাডামের হাতেপায়ে ধরে চেম্বারের আয়ার কাজ টুকু যোগাড় করে দিয়েছিল। প্রতি বিকালে সে বের হত, চেম্বার শেষে রাত করে ফিরত। পাড়ার লোকে কানাঘুষো করত, জনে জনে গিয়ে কে বোঝাবে এইসব। শেষে পাড়াবেড়ানি সুমনের দাদী কে চাকরির কথা বলাতে সেই সবাই কে জানালো বিউটির চাকরির কথা , অন্তত তাকে রঙ মেখে রাস্তার ধারে খদ্দের যোগাড় করতে হচ্ছে না -

এই রে, তিন টা বাজে। রুবেল রাসেল স্কুল থেকে ফিরলে তাড়াতাড়ি তাদের খেতে দিয়ে কাজের দিকে রওনা করল সে। আসগর মারা গেছে এক বছর হয়ে গেছে। এখন সে নিজেকে বলে জেসমিন ম্যাডামের পি এস। আয়া শুনতে ভাল লাগে না। সেই জড়সড়, বোকাসোকা গেয়ো বউ থেকে আজ সে ভালই চটপটে মহিলা। মাঝেমধ্যে রোগীদের সিরিয়াল আগুপিছু করে বেশ উপরি কামাই ও হয়।

করতে হয় এসব, পাপী পেট। আগে খারাপ লাগত, এখন আর লাগে না। জেসমিন ম্যাডামের ভিজিট ৫০০ টাকা, সে সিরিয়াল আগুপিছু করে পায় ২০০ টাকা। এতে রোগীরা কিছু মনে করে না, বরঞ্চ ম্যাডামের কাছে গিয়ে ভিজিট নিয়ে দরাদরি করে, আজব দুনিয়া, সবাই জিততে চায়, যে যেভাবে জিততে পারে।

জেসমিন ম্যাডামের পসার ভাল। ম্যাডাম দেখতে বেশ সুন্দরী, ডাক্তারও ভাল, বেহুদা সিজার করেন না। রোগীর সাথে হাসিমুখে কথা বলেন, রোগী তাকে ভয় পায় না। তবে ম্যাডাম মানুষ টা ভাল না মন্দ, সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। মাঝেমধ্যে মনে হয় বেশ লোভী মহিলা, রোগীদের বাচ্চাকাচ্চা হলে তাকে শাড়ি দিতে হয়। নয়ত উনিই ইনিয়েবিনিয়ে মনে করিয়ে দেন। মাঝেমধ্যে রোগীর হাতে সোনার চুড়ি দেখলে বলবেন, দাও ত পরে দেখি আমাকে কেমন মানায়। তুমি ত পরের মাসে আবার আসবে তখন নিয়ে যেও।

অথচ ম্যাডামের কিন্তু কম নেই, প্রতি ঈদে যাকাত ই দেন পঞ্চাশ হাজার। বিউটিকেই দেন ২০-২৫ হাজার। আসগরের গ্রামে কিছু ভিটেজমি আছে, সেখানে একটু একটু করে বাড়ি করছে বিউটি। নিজের একটা ঠাই থাকা দরকার। অথচ, অন্যের শাড়ি গয়না দেখলে উসখুস করবে সেটা নেবার জন্যে।

আজ একটা রিক্সা নিল বিউটি। রিক্সা থেকে নামতে ক্লিনিকের দারোয়ান তাকে ভুলে সালাম ই দিয়ে ফেলল। বিউটি ও হাসিমুখে সালামের উত্তর দিল। দারোয়ান রহমান অবাক হয়ে বললো, আপ্পারে ত চিনা যাইতেছে না, বিউটি আপা, মনে করছিলাম, নতুন কোন ডাক্তার। রহমানের মুগ্ধতা টুকু উপভোগ করে বিউটি, স্বামী মরার পর ছোকছোক করার লোকের অভাব নেই, কিন্তু এমন সসম্মানে চেয়ে থাকার মত কারু অভাব মাঝেমধ্যেই অনুভব করে সে।

যা হোক, তাড়াতাড়ি এসে চাবি দিয়ে চেম্বার খুলে সে। টেবিল গুছিয়ে চেয়ারে টাওয়েল বিছায়। পুরো রুম গুছিয়ে বাইরে টেবিলে সিরিয়ালের খাতাকলম নিয়ে বসে। এমন সময় আসে তানিয়া ম্যাডাম, পাশের রুমে রোগী দেখেন, শিশু বিশেষজ্ঞ । এসেই বলে আরে বিউটি, খুব সুন্দর শাড়ি ত, খুব মানিয়েছে তোমাকে। উচ্ছ্বসিত হয়ে তানিয়া কে শাড়িপ্রাপ্তির ইতিহাস শোনায় সে। একটা ভাল শাড়ি কত আনন্দ দিতে পারে মেয়েদের। তানিয়া হাসিমুখে শোনে, এরপর চেম্বারে ঢুকে যায়। তানিয়ার কথা ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিউটি। এত ভাল একটা মেয়ে, অথচ জামাই টা হচ্ছে এক নম্বরের খবিশ। আরেক বিয়ে করেছে বউ বাচ্চা সব রেখে। জেসমিন ম্যাডাম ও এমন, তানিয়া কে আহলাদ করে বলছে এহসানের বউকে দেখলাম ওইদিন, খুব সুন্দর আর লম্বা ফিগার, ভাল বউ পেয়েছে এইবার। ভাল ফ্যামিলির মেয়ে, ওর মা আমার রোগী। এত লক্ষ্মী একটা মেয়ে, একেবারে পায়ে ধরে সালাম করল আমাকে, অল্প বয়স, এখনো ফাইনাল প্রফ দেয় নাই। এই মেয়ে সংসারী হবে, সবাই ত স্বামী ধরে রাখার কপাল নিয়ে আসে না।

তানিয়ার মুখ টা ছাইবর্ণ হয়ে গেছিল একেবারে। ম্যাডাম এমন কেন আল্লাহ ই জানে, সতীনের সুনাম শুনতে কোন মেয়ের ভাল লাগে না, এই কথা কি উনি জানে না নাকি বুঝেই আরেকজন কে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পায়?

রোগী জমা হয়েছে প্রায় ৭ জন। তিনজনের ই ডেলিভারি হবে আগামী মাসে। তারমানে আরও তিন টা শাড়ি। অত শাড়ি দিয়ে এই বেটি কি করে কে জানে?

এমন সময় জেসমিন ম্যাডাম আসলেন। আজ উনি একটা জর্জেট থ্রিপিস পরে এসেছেন। তাড়াহুড়ায় মনে হয় লিপ্সটিক দিতে ভুলে গেছেন, চুল ও ভেজা। আজকের দিনে একমাত্র উনিই বিউটি কে দেখে বিরক্তিতে ভ্রু কুঁচকে তাকালেন। এরপর বললেন, এই রোগী পাঠা, সময় নাই আজকে।

রোগীর সামনেও তুচ্ছ কারণে বকাঝকা দিলেন। জামদানীর আনন্দ ফিকে হয়ে যাচ্ছিল জেসমিনের। সবচেয়ে অবাক হল, যখন চেম্বার শেষে ম্যাডাম বললেন, ' এই শুন, এই শাড়িটা তোকে একদম মানাচ্ছে না, কাল শাড়িটা নিয়ে আসিস। আমার পছন্দ হয়েছে মোটামুটি। আমি তোকে অন্য দুইটা শাড়ি দিব, তোর ডাবল লাভ হবে। মনে থাকবে ত? কালই আনবি কিন্তু। '

বিউটর ইচ্ছা হয় বলে, আয়ার শাড়ি পরবেন, আপনার কি শাড়ির অভাব? কিছুই বলা হয় না। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে। এর কাছেই অন্নবস্ত্র বাধা তার। দিয়েই দিতে হবে শাড়ি টা।

তবে আজ বিউটি একেবারে নিশ্চিত হয়ে গেল, জেসমিন ম্যাডাম মানুষ টা একেবারে ছোটলোক, লোভী, ছ্যাচ্চর (আরও অপ্রকাশ যোগ্য সব বিশেষণ।)

পুনশ্চঃ দুই সপ্তাহ পর পুরনো রংচঙে দুইটা সিনথেটিক শাড়ি দিয়েছিল ম্যাডাম, যা পরলে তার আয়া পরিচয় নিশ্চিত হয়। নীল জামদানী টা আর কখনো দেখা যায় নি, ম্যাডামের অসংখ্য শাড়ির ভীড়ে হারিয়ে গেছে বিউটির একদিনের রঙ বদলে দেয়া আশ্চর্য সেই শাড়ি টা। মাঝেমধ্যেই বুকে হাহাকার হয় শাড়িটার জন্য, আহা রে কাংগালের ধন টুকু, রাজার হাত থেকে রেহাই পেল না সে।

প্ররোচিত

আজ ইভিনিং শিফট এস আই তৌহিদের। ৬ মাস হল এই মফস্বলে পোস্টিং। এক কাপ রঙ চা খেতে খেতে ফাইল গুলি দেখছিল সে।

এমন সময় কন্সটেবল দুলাল এক যুবক কে নিয়ে প্রবেশ করল, স্যালুট দিয়ে বললো, সার, এ সারেণ্ডার করতে চায়, ডিগ্রী কলেজের রুপার হাজবেন্ড।

তৌহিদ আগ্রহ নিয়ে তাকাল। দুদিন আগে এখানে একটি আত্নহত্যার ঘটনা ঘটে। শশুড়বাড়ি তে গৃহবধুর আত্নহত্যা। প্রাথমিক তদন্তে সুইসাইডের সত্যতা নিশ্চিত হয়েছে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। পাড়াপ্রতিবেশি রা মিলেই দরজা ভেংগে লাশ সিলিং এ ঝুলন্ত পায়। কোন সাইন অফ স্ট্রাগল নেই। ক্লিয়ারকাট সুইসাইড, পোস্ট মর্টেমেও ডেথ বাই হ্যাংগিং পাওয়া গেছে।

ঝামেলা শুরু হয়েছে মেয়েটির কলেজ থেকে। সোস্যাল মিডিয়াতেও হৈচৈ পরে গেছে। সবার ধারণা, শশুড়বাড়ির অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্নহত্যা করেছে। প্রভোকড সুইসাইডের বিচার চায়। কলেজের ছেলেপুলে গিয়ে দুটো বাস

ভেংগেছে আর একটা সিএনজি জালিয়ে দিয়েছে। এমপির কল পেয়ে মেয়েটির শসুর শাশুড়ি আর ননদকে কে গ্রেপ্তার করে থানা হেফাজতে আনার পর পরিস্থিতি শান্ত হয়েছে। যদিও জিজ্ঞাসাবাদের পর তেমন কিছু পাওয়া যায় নি। রুপা একটু রাগী আর অভিমানী ধরনের মেয়ে ছিল, সংসারের খুটিনাটি বিষয় নিয়ে শাশুড়ি ননদের সাথে লাগালাগি হত, বড় কোন ব্যাপার না। সব সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

- আপনার নাম কি? বয়স? স্থায়ী ঠিকানা? দুলাল, এগুলি ফাইলে লিখে রুপার ফাইলে রেখে দাও। তৌহিদ বলে।

- স্যার, আমি রায়হান, রুপার স্বামী। আমার বাবা, মা আর বোন কে ছেড়ে দেন। তারা নির্দোষ। আমি আত্নসমর্পন করছি, শাস্তি যা হবার আমাকেই দিন।

তৌহিদ ভ্রু কুচকে রায়হানের দিকে তাকিয়ে রইল। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে সে ঘটনার দিন বাড়ি ছিল না, সকালেই বের হয়ে গেছিল। তাহলে দোষ স্বীকার করছে কেন? কথা বের করতে হবে। নারী নির্যাতন কারী লোকগুলিকে একেবারে সহ্য হয় না তার। চুরি ডাকাতি না হয় মানুষ পেটের দায়ে করে। বউ পেটানোর মানে কি?

- আপনার কথায় ত আসামি ছাড়া যাবে না। তাছাড়া আপনার আচরণ সন্দেহজনক। এ দুইদিন পালিয়ে রইলেন কেন? আর ঠিক কি কারণে রুপা সুইসাইড করল তার বিশদ ব্যাখ্যা দিন। সন্তোষজনক হলে আপ্নাদের উকিল জামিনের আবেদন করতে পারবে।

রায়হান ম্লান হাসে। উকিল কই পাব স্যার? সত্যি বলতে কি, রুপা অভাব সহ্য না করতে পেরেই গলায় দড়ি দিয়েছে। আমার বাবা প্রেসারের রোগী, মাও

দুর্বল মানুষ, বোন টার বিয়ে দিতে পারি নি এখনো - আমাদের পরিবার টা ধবংস হয়ে যাবে। একটু দয়া করুন, স্যার।

- সিনেমার ডায়লগ দেয়া বন্ধ করুন। থানা দয়াদাক্ষিণ্যের জায়গা না। বাড়ির বউয়ের উপর অত্যাচার করার আগে মনে ছিল না এসব? মেয়েটাকে মেরে তারপর সবাই মিলে ভালমানুষ সাজা হচ্ছে? কি করেছিলেন ঠিকঠাক বলুন আগে।

- আমি ত সারেণ্ডার করলাম ই, তারপর ও কেন আমার পরিবার কে আটকে রাখবেন? যদি টাকার আশায় এগুলো করেন, তাহলে আগেই বলে রাখি, টাকা দেবার মত সামর্থ্য আমাদের নেই, মিছিমিছি সময় নষ্ট করবেন না। পরে আফসোস -

ঠাস করে এক থাপ্পড় পরল রায়হানের বাম গালে। ঘুষের কথায় মাথায় রক্ত চড়ে গেছে তৌহিদের। আরেক চড়ে চেয়ার থেকে পরে গেল রায়হান।

- আরেকবার বড় বড় কথা বললে জুতিয়ে চাপা ভাংব তোর। মিনকা বদমাশ কোথাকার। কি ঘটনা ঠিকঠাক না বললে মাইর কাকে বলে সেটা আরো ভাল করে বুঝিয়ে দেব, রাগে ফুসতে থাকে তৌহিদ। কন্সটেবল দুলাল দৌড়ে আসে। এই নতুন অফিসার গুলির যে মাথা গরম, যাকে তাকে না বুঝে মেরে বসে, পরে দেখা যায় এরা লতায়পাতায় এমপির আত্নীয়, থানাশুদ্ধ পুলিশ এর ফল ভোগ করে। ট্রান্সফার হম্বিতম্বি, পরের জেনুইন কেসে এর এডভান্টেজ নেয়া।

- স্যার, স্যার আপনি বসেন, আমি দেখছি। ওই মিয়া, মিছামিছি ঘাউরামি করেন কেন? যা জিগেস করে সোজা উত্তর দিলেই ত হয়। রায়হান কে ফ্লোর থেকে উঠায় সে। তবে চেয়ারে বসায় না, মাটিতেই বসিয়ে রাখে। গোমড় না কমলে আরো ত্যাদরামি করে সময় নষ্ট করবে, এতে স্যারের রাগ ও কমে

আসবে। ১৫ বছরের চাকরি, রুমের তিনজনের মধ্যে তার অভিজ্ঞতা ই সবচেয়ে বেশি।

- এই, কথা বলস না কেন? আরো মাইর খাবার শখ আছে? স্টুপিড কোথাকার।

মুখের ভেতর নোনাসাধ টের পায় রায়হান, কেটে গেছে মনে হয়, রক্ত মাখা থুতু ঢোক গিলে সে । সে হতভম্ব হয়ে গেছে, রেগে যাবার মত ত সে কিছু বলে নি। কি শুনতে চাইছে পুলিশ? তার আর রুপার সফল প্রেম আর ব্যর্থ দাম্পত্যর কাহিনী? বেশ তাই হোক।

আমার আর রুপার প্রেমের বিয়ে স্যার। ১ বছর প্রেমের পর আমরা পালিয়ে বিয়ে করি।

বিরক্ত লাগছে তৌহিদের, শালা ফকিন্নির আবার প্রেমের বিয়া লাগাইছে, এহ। মুখে বলে, প্রেম হয়েছে কিভাবে?

- ফেসবুকে। আমি লিখালিখি করতাম, রুপা গল্প পড়তে ভালবাসত। এভাবেই।

- তুই ফেসবুক সেলেব্রেটি? কি লেখস? ফলোয়ার কত?

- গালি দিচ্ছেন স্যার? আপনিও ত আমার ফ্রেন্ড লিস্টে আছেন, রুপা কে নিয়ে যে গল্পটা লিখেছিলাম তাতে কমেন্টে লিখেছিলেন অসাধারণ লিখছেন বস।

- ফেসবুকে নাম কি?

- বাউন্ডুলে রায়হান।

থমকে যায় তৌহিদ, এ ছেলেটা বেশ সুন্দর সব গল্প লিখত। সবার কমেন্টের সুন্দর সব উত্তর দিত। সেই লোক নারী নির্যাতনকারী, ভাবা যায়?

- পালিয়ে বিয়ে করতে হল কেন?

- রুপার বাবার হঠাৎ খেয়াল চেপেছিল মেয়ে বিয়ে দিয়ে দেবে, পরের বছর হজ্বে যাবে তাই। অবস্থাপন্ন ঘরের সুন্দরী তরুণী, সম্বন্ধের লাইন লেগে গেল। প্রতি সপ্তাহে ওকে দেখতে আসত। রুপা খুব নার্ভাস ধরনের মেয়ে ছিল, সে আমাকে বিয়ের জন্য চাপাচাপি করতে লাগল। আমি বিয়ে করতে চাই নি, বুঝেছিলাম এর ফল ভাল হবে না। রুপা জেদ ধরল, গাছতলায় থাকবে, একবেলা উপোস দিবে এরকম অদ্ভুত কথা বলত।

- তাতেই রাজি হয়ে গেলেন?

- অত গাধা আমি না স্যার। ওকে বলেছিলাম কোর্ট ম্যারেজ করে যে যার মত থাকি, চাকরি বাকরি হলে তখন সবাই কে জানাব। ওর এক বান্ধবী ব্যাপার টা জানত, সে রুপার মাকে বলে দিল, তারা ডিভোর্সের জন্য চাপাচাপি করতে লাগল, ও সুযোগ বুঝে বাসা থেকে পালিয়ে আমাদের বাড়ি এসে উঠল।

- তারপর?

- আমার মা, বাবা খুব রাগ করলেন। বাবা প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার, এমনিতেই সংসার চলে না। এরপর আরেকজনের খোরাকি, খুব বেশি হয়ে যায়। উনারা রুপা কে ফিরে যেতে বল্লেন, আমাকেও বললেন ওকে ওর বাড়ি দিয়ে আসতে। রুপা রাজি হল না।

কিন্তু, আমাদের বাড়ির অবস্থায় ও মানাতে পারছিল না। চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, তবুও করবে টা কি? আমি থাকতাম বসার ঘরের চৌকিতে, সেটি সরিয়ে ফ্লোরে থাকতাম। মুরগী হত মাসে একদিন, বাকি সময় মাছ, ডাল, ভর্তা কোনভাবে চালিয়ে নিত মা। দিনের পর দিন বেচারি কোন রকমে গিলত।

এসব বড়লোকিপনা আমার মায়ের ভাল লাগত না, প্রায়ই বকতেন আমাদের, বলতেন তুই তোর রাজরাণী নিয়ে ঘরজামাই হয়ে যা। আমাদের রেহাই দে।

- আপনার কোন ইনকাম ছিল না?

- কি করে থাকবে? আমি স্থানীয় কলেজে কোন রকমে ফিলসফিতে অনার্স পড়েছি। চাকরি দূরে থাক, টিউশনি জোটাতে কষ্ট হত। ছাত্রদের বাপ মা বলত আর্টসের ছাত্র কি পড়াবে আর? পরে দু'হাজার টাকার একটা টিউশনি পেলাম, ছাত্রী ক্লাস থ্রিতে পড়ে। যেতে আসতেই এক হাজার টাকা চলে যেত। উহ, কি দুসহ জীবন!

- আর রুপা?

- ও কলেজে যাবার জন্য ছটফট করত, পড়তে চাইত। কিন্তু আমাদের কি সাধ্য তার পড়ার খরচ টানি। খিটখিটে হয়ে গেল খুব। সারাক্ষণ মুখভার করে বসে থাকত। আমি বাড়ি ফিরতে চাইতাম না, ইচ্ছে হত রিক্সা চালাই। কত ভাড়া বেড়েছে আজকাল। কিন্তু পরিচিত কেউ দেখলে কি বলবে সে ভয়ে চালাতে পারতাম না।

- চাকরির চেষ্টা করতেন না?

- সে করতেও টাকা লাগে। ছবি, বায়োডাটা প্রিন্ট কর, এদিক ওদিক যাও। তবু করতাম, কিন্তু একেক টা দিন আর পার হচ্ছিল না।

- ঘটনার দিন কি হয়েছিল?

- ৫ তারিখে? সেদিন কিছু হয় নি, আগের দিন কিছু টা ঝগড়া হয়েছিল।

- কি নিয়ে?

- দুপুরের রান্না নিয়ে। বাবা আধা কেজি শিংমাছ এনেছিল ৫০০ টাকা দিয়ে। মা সেগুলি চুলায় চড়িয়ে রুপাকে বলেছিল দেখতে, রুপা একবার দেখে ঘরে চলে এসেছিল, আমার সাথে গল্প করছিল । মা কতক্ষণ পর গিয়ে দেখে মাছ পুড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি চুলা নিবিয়ে রুপাকে ডাকল, রুপা কাছে যেতেই খুন্তি দিয়ে ওর হাতে এক বাড়ি দিয়ে দিয়েছে। রুপা খুবই রেগে গেছিল, মার হাত থেকে খুন্তি নিয়ে ছুড়ে ফেলেছিল, বললো এত্তবড় সাহস আপনার, আপনি আমার গায়ে হাত তুলেন।

চেচামেচি শুনে আমি দৌড়ে আসি, মা আমাকে শাসাতে লাগলেন, এক্ষুনি এই বউ শাসন না করলে উনি আত্নঘাতি হবেন। আমার বোন এসে মায়ের পক্ষ নিল, বললো, হয় তোর বউ মার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবে, নয়ত তুই বউ নিয়ে বের হয়ে যাবি। আমি রুপা কে বললাম, মায়ের কাছে ক্ষমা চাও, দোষ ত তোমার। রুপা রাজি হল না, আমার মা বিলাপ শুরু করলেন, আমার বোন সেই সাথে যোগ দিল - এরকম অবস্থায় আমি আর মাথা ঠিক রাখতে না পেরে রুপার গালে এক চড় বসিয়ে দিলাম। ম্লান হাসে রায়হান। এই আপনার চড় টা থেকেও আস্তে দিয়েছিলাম স্যার।

- তারপর?

- এরপর রুপা একদম চুপ হয়ে গেল। আমার মা তারপর ও আশা করছিলেন চড় খেয়ে রুপা হয়ত ক্ষমা চাইবে, কিন্তু ও আর কিছুই বললো না। চুপ করে ঘরে গিয়ে বসে রইল।

- আপনি আর কিছু বলেন নি?

- বলেছিলাম, আমাদের একটু মানিয়ে চলতে হবে, কাজকর্ম জুটলে আমাদের অবস্থা এমন থাকবে না।

- ও কি বলেছিল?

- অন্যমনস্ক গলায় বলেছিল, তিন টা শিংমাছের মুল্য ও তার জীবনের মুল্য থেকে বেশি। বিরক্ত লাগছিল আমার, বলেছিলাম, তোমাকে কাল তোমাদের বাড়ি রেখে আসব। উনারা যা বলে তাই করো। প্রেম বিয়ে সবকিছুর শখ ত মিটেছে, এখন বাপেরবড়ি গিয়ে দুটো ভালমন্দ খেতে পেলেই তোমার চলবে। সংসারে মানিয়ে চলার মত মানসিকতা তোমার নেই। আমি তোমাদের বউ শাশুড়ির মাঝখানের টানাটানি তে পরতে চাই না।

- তারপর?

- সে রাতে আর কিছু খায় নি রুপা। আমি পরদিন সকালে বের হয়ে গেছিলাম, সাভারের একটা গার্মেন্টস এ ফ্লোর সুপার ভাইজারের ইন্টারভিউ ছিল, মা পাশের বাসায় গেছিলেন আমার বোন কে নিয়ে, বাবা স্কুলে। তখন রুপা গলায় ফাস নেয়। বাকি টা ত আপনারা জানেন।

- দুদিন পালিয়ে ছিলেন কেন?

- খবর শুনে নিজেকে আসামি মনে হয়েছিল তাই। আমিই ত দায়ী, তাই না, স্যার? মেয়েটা ভালবেসে আমার কাছে এল, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলাম না। রুপার মৃতদেহ দেখতে সাহসে দিচ্ছিল না। সহ্য হত না।

আমার ফ্যামিলি কে ছেড়ে দিন, স্যার। আমি যা শাস্তি হয় মাথা পেতে নিব।

- আপনাকে হাজতে চালান করে দেব। কিছু ফাইল ওয়ার্ক আছে, সেগুলি করে আপনার ফ্যামিলি কেও ছেড়ে দিব। কিছু খাবেন? হাজতে অনেকদিন ভাল কিছু জুটবে না।

- একটু ভাত তরকারি হলেই হবে স্যার, দুদিন কিছু খাওয়া হয় নি।

দুলাল কে খাবারের ব্যবস্থা করতে বলে রায়হানের বক্তব্য ফাইলে নোট করতে শুরু করে তৌহিদ, রুপার পরিবার, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব এদের স্টেটমেন্ট ও নিতে হবে।

ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তৌহিদ। বেকার অবস্থায় তৌহিদের গার্লফ্রেন্ড হঠাৎ এক ইতালি প্রবাসী কে বিয়ে করে ফেলেছিল। অনেক অভিমান হয়েছিল তৌহিদের, আজ হঠাৎ ওকে ক্ষমা করে দিল তৌহিদ। প্রেম আর সংসারে প্রায় ইহকাল পরকালের মত পার্থক্য সেটা সে আজ বুঝতে পারল।

বুদ্ধি

জাহানারা খাতুনের বুদ্ধি অনেক। এখন তার বয়স ৩০ । তাই বলে বুদ্ধি তার বয়সের সাথে হয় নাই, সে জন্ম থেকেই বুদ্ধিমতী। কথা শেখার সাথে সাথেই তার বুদ্ধির চমকে গ্রামবাসী হতভম্ব। নেহায়েত গ্রামে স্কুল কলেজ ছিল না বলে, নয়ত সে ঠিকই উকিল মোক্তার হয়ে দেখিয়ে দিত। তবে তার বুদ্ধিতে লোকে মুগ্ধ হবার বদলে বিরক্ত হত বেশি, কেননা তার বুদ্ধিতে অন্য কারু কোন উপকার হত না। উলটে অন্যকে বিপদে ফেলে হলেও তার স্বার্থ উদ্ধার করার ক্ষমতা ছিল লক্ষ্যনীয়।

জাহানারা পড়তে লিখতে পারে। তার বড়ভাইর কাছে শিখেছে, সে বড়ভাই স্কুল পাস। জাহানারা দেখতেও ভাল, তাই বার বছর বয়সে যখন রহমত তালুকদার তার দ্বিতীয় পক্ষ হবার প্রস্তাব পাঠায়, তার বাপের সাথে সেও সানন্দে রাজি হয়ে যায়। তাদের অভাব সভাবের ঘর, মোটাচাল শাক মাছ খেতে হয় , কমদামী কাপড় পরতে হয়। জাহানারা আরো ভাল থাকতে চায়, গোসত দিয়ে ভাত খেতে চায়, বড়লোক বাড়ির মেয়েদের মত কাপড় পরতে চায়। সে জানে

তার জন্য রহমত তালুকদারের ছেলের সম্বন্ধ আসবে না, বাপকেই বিয়ে করতে হবে। আরেক হাভাতে ঘরে গিয়ে পরার কোন শখ তার নেই।

বয়স বারতেই সে সংসারের অনেক গুপ্ত বিষয় জানে, তার মায়ের ও বুদ্ধি বেশি। তার মা শিখিয়ে পরিয়েই তাকে রহমত তালুকদারের বাড়ি পাঠায়। নতুন শাড়ি গয়না, বড় বাড়ি দেখে সে আনন্দে ঝলমল করে, তালুকদার ও নিশ্চিত হয় বেশ ভাল কাজ করেছে সে। বিয়ের রাতে অন্য কোন মেয়ে হলে যেখানে বয়স্ক স্বামী কে দেখে ভয়ে ভিমড়ি খেত, সেখানে জাহানারা দিব্যি ঘোমটার ফাক দিয়ে লাজুক লাজুক হাসি দিতে থাকে।

তালুকদারের বড় বউ আশরাফুন্নেছা নির্বোধ প্রকৃতির। তার প্রথম পক্ষের শশুড় মন্তাজ মাতব্বরের বড় মেয়ে হল তার বড় বউ, আরো তিন ভাই ছোট। মাতব্বর পঞ্চায়েত প্রধান, ন্যায়বিচারক হিসেবে তার সুনাম ছিল। পিতৃপুরুষের ও জমিজিরাত অনেক। রহমত তালুকদারের ও কম নেই, তবে কিনা শশুড়ের সম্পত্তি তে ত জামাইর হক থাকেই। আশরাফুন্নেছা স্বামীর অনুমতি ছাড়াই তার ভাগের জমি ছেড়ে দিয়েছে, মাতবর সেই জমিতে স্কুল করে দিয়েছে, আর কিছু পাবার আশা নেই। এই কারণে রহমতের আর তার মেয়ের উপর দিল নেই।

দিল না থাকার আরো কারণ আছে, কেউ সাধ করে দুই বিয়ে করে না। আশরাফুন্নেছা বউ হিসেবে যাচ্ছেতাই। মেয়েমানুষ স্বামীর সেবা খেদমতে ব্যস্ত থাকবে, সমীহ করবে তা না ভাব দেখ, যেন তালুকদার তার ইয়ার দোস্ত। চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলবে, গ্রামের মানুষের জন্য সুপারিশ করবে, এর জমি ছেড়ে দাও, তার হিল্লে বিয়ে দিও না, দুই শরিকের মিটমাট করে দাও, বাপের মত সেও পঞ্চায়েতের বিচারে নাক গলাতে চায়। আরে, গ্রামে প্রতিপত্তি বজায় রাখতে হলে

কিছু ঝগড়া বিবাদ আগুনে হাওয়া দেওয়ার মত জিইয়ে রাখতে হয়। ভাল মানুষ কেউ পুছে? তালুকদার শক্ত করে বলে দিয়েছে সে যেন এসব সুপারিশ নিয়ে না আসে।

বেকুব মহিলা, অজাত কুজাত সবাইকে ঘরে ঢুকাবে। এর ছেলেকে দুধ খেতে দেবে, তার মেয়েকে শাড়ি দিবে, সেদিন কার পাপের ফল এক নতুন বিয়োনো বাচ্চা পাওয়া গেছে মসজিদের দরজায়, সেই মেয়েকে এনে ঘরে তুলেছে, তাকে নিজের মেয়ের মত পালছে।

অবশ্য তিন ছেলেমেয়ে ভালই হয়েছে। মেয়েকে বড়ঘরে বিয়ে দিয়েছে, দুই ছেলেকে সদরে পাঠিয়েছে পড়তে। গতবছর শশুর সাহেব মারা গেলেন, আশরাফুন্নেছা বাবার শোকে সংসারে আরো অমনোযোগী, তাই রহমত তালুকদার বাধ্য হয়েই জাহানারে কে - ব্যাপার টা আগেই হতে পারত, শশুর জীবিত থাকায় খুব একটা সাহস হয় নি। কিসে যেন বাধত।

জাহানারা যখন ঘরে আসে আশরাফুন্নেছা তখন ৩৫ এ। মহিলা আসলেই হাবা, নয়ত জাহানারা কে এভাবে মাঠ ছেড়ে দিত না। জাহানারার বাপেরবাড়ি এক গ্রামে, জাহানারার মা নিয়মিত সংসারের কাঠিনাড়া করত, আশরাফুন্নেছা নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আলাদা ঘরে আশ্রয় নিল। তালুকদার কে একটাই অনুরোধ করল, তার পালক মেয়েটিকে যাতে বাড়িছাড়া না করা হয়। তালুকদার সম্মত হয়, দুই বউয়ের ক্যাঁচক্যাঁচানি তে না পরলেই হয়।

সংসারে সাশ্রয় হতে লাগল বেশ। হাভাতে লোকজনের আনাগোনা কমে যেতে লাগল। জাহানারা যে সকল কে ফিরাত তা না, যেসব অভাবী রা মাথায় কিছু বুদ্ধি ধরত তারা জাহানারা কে বেশ তেল দিয়ে, সংসারের বাড় বাড়ন্তর

প্রশংসা করে কিছু খুদকুঁড়ো জুটিয়ে নিত। অনেকে আবার পুরো গ্রামের খবরাখবর দিত, কেউ আশরাফুন্নেছার সুনাম বা জাহানারার কু গাইলে সে খবর ও জাহানারার অজানা থাকত না। এর ফাঁকেফাঁকে জাহানারা দু' সন্তানের মা। শক্ত আঁচলে বেধেছে সে তালুকদার কে, আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। আশরাফুন্নেছা আরো গুটিয়ে গেছে। দেখলে মনে হয় জাহানারার শাশুড়ি।

এমন করেই প্রায় ১৮ বছর গিয়ে এখন ১৯৭১। ঢাকায় যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধ মানে এক তরফা মানুষ মার, হিন্দুদের মেরে ধরে ভাগিয়ে দাও, গাদ্দারবাড়ির মেয়েমানুষ ভোগ কর। গ্রামে মিলিটারি আসার আগেই রহমত তালুকদার তার পক্ষ নির্বাচন করে ফেলেছে। অবশ্যই সে পাকিস্তানের পক্ষে থাকবে, মুসলমান হয়ে সে কি ইন্ডিয়ার ষড়যন্ত্রে যোগ দেবে? কোনদিন না। আর প্রতিরোধ করে লাভটাই কি? বন্দুক কামানের বিরুদ্ধে কি দা- বটি- লাঙল দিয়ে যুদ্ধ করবে? পাগলের প্রলাপ আর কি।

হিন্দুগুলির কাছ থেকে পানির দরে জমির দলিল গুলি রেখে ইন্ডিয়া পাঠিয়ে দিয়েছে। আর আছে কয়েক ঘর ধোপা, পরামানিক, কর্মকার। এদের তাড়ায় নি। থাকুক, কাজে লাগে বেশ। তবে গ্রামে কিছু নির্বোধ আছে, তারা নাকি যুদ্ধ করবে, অস্ত্র আনতে ইন্ডিয়া গেছে। মানুষের নির্বুদ্ধিতার আসলে কোন সীমা নেই। অবশ্য বুদ্ধিমানেরা নির্বোধ দের থেকেও ফায়দা নিতে পারে, তালুকদার ঘর গুলি চিনে রেখেছে। মিলিটারি হুজুর রা এলে এদের ঘর দেখিয়ে দিলে তার প্রতিপত্তি মিলিটারিতেও ছড়াবে।

যথাসময়ে, পাকিস্তানি দের নিজেই দাওয়াত দিয়ে আনল সে। শশুড়ের দেয়া স্কুলে ক্যাম্প হল। হিন্দুবাড়ির দুধেল গরু বাছুর জবাই দিয়ে আপ্যায়ন করা হল।

প্রচুর ঘরবাড়ি লুটপাট হল, আরো অনেক সম্পদ এল তালুকদারের ঘরে। গ্রামের বুদ্ধিমান লোকজন রাজাকার বাহিনী তে যোগ দিল। বলাবাহুল্য, জন পঞ্চাশেক লোক মারতে হল। গাদ্দার বাড়ির লোক তারা। যুদ্ধে এসব চলেই, ব্যাপার না।

মিলিটারি দের মেয়েমানুষ লাগে প্রচুর। বাংলাদেশ টা কেমন বেহেশতর মত লাগে পাকিস্তানি দের। বাহাত্তুর হুরপরীর মত অগণিত মেয়েমানুষ। ধরে আন, ইচ্ছেমত ভোগ কর। এক সময় ভোগ এক ঘেয়ে লাগতে থাকে, তখন বিচিত্র আনন্দ পেতে এদের ছুরি দিয়ে ফালাফালা করে ফেল, ডিম ভরে দাও। বেশুমার আনন্দ, বেহেশতে নিশ্চয় এসব করা যাবে না। তারা ত পবিত্র নারী, আর এইগুলা হচ্ছে গাদ্দারবাড়ির নারী, এইগুলারে যা খুশি কর।

রহমত অবশ্য মেয়ে সাপ্লাই দিতে দিতে হয়রান হয়ে যায়। সবাই ত আর গাদ্দার না। অনেক নিরীহ বাড়ি থেকে টেনে আনতে হয়। কার বাড়ি থেকে আনবে এইটা বিবেচনার বিষয়।

এ ব্যাপারে জাহানারা বেশ সাহায্য করে, কোন কোন বাড়িতে মেয়ে পাওয়া যায় বলে দেয়। অনেক মহিলা তাকে যথেষ্ট সমীহ করত না বলে তাদের উপর বেশ রাগ হত, সেই বাড়িগুলির নাম বলে দেয়। দামী শাড়িকাপড় বোঝাই হয়ে আসে, একেকদিন একেক টা পরে অন্য রাজাকারের বউদের দিয়ে দেয়। তালুকদার খুশি হয়, তার উপযুক্ত বউ।

নির্বোধ আশরাফুন্নেছা এখানে আবার ঝামেলা বাঁ্ধায়। সে তালুকদারের হাতেপায়ে পরে কাঁদে, বিষ খাবার ভয় দেখায়। জাহানারা-রহমত হেসেই খুন, সে বিষ খেলেই কার কি? পশুপাখির চেয়ে বেশি গুরুত্ব ত তার এই বাড়ি তে নেই। আশরাফুন্নেছা গলায় দড়ি দিয়ে মরে। তার পালক মেয়ে মায়া দা নিয়ে ছুটে

আসে রহমত কে খুন করবে বলে। বোকা মেয়ে, রহমত তার হাত মুচড়ে দা নিয়ে ফেলে। নিমকহারাম বেজন্মা মেয়ে, পাপের ফসল টাকে একদম চুলের মুঠি ধরে মিলিটারি ক্যাম্পে দিয়ে আসে। ক্যাপ্টেন খুবই খুশি হয়। অত্যাচারে বন্দি গাদ্দারের মেয়েগুলি একেবারে অখাদ্য হয়ে গেছে, সেখানে এই সুস্বাস্থ্যর ১৮ বছরের মেয়ে। আহ, কি আনন্দ। মায়া জলজলে চোখে তালুকদার কে দেখে, হিসহিস করে বলে, তোমারো দিন আইব আব্বা। আব্বা ডাকতাম, বাপের কাজ টাই কইরা দেখাইলা।

ক্যাপ্টেনের অবশ্য তর সয় না, সে মায়াকে হিচড়ে নিয়ে যায় তার ঘরে।

ফেরার পথে হঠাৎ মুস্তাফিজ এসে সালাম দেয়, কাকা, শরীর টা ভাল? তালুকদার অবাক হয়ে তাকাতেই একটা বর্শা বুকে গেঁথে যায় তার। রহমান গলায় একটা গামছা প্যাচ দিয়ে ধরে। তালুকদার বিস্ফোরিত চোখে এক সাথে অনেক ভাবনা নিয়ে দোযখের রাস্তা ধরে।

ক্যাপ্টেন ছিল মায়া কে নিয়ে ব্যস্ত। বাকি রা মায়ার উচ্ছিষ্টর অপেক্ষায়। মুক্তিবাহিনী ঘিরে ফেলে মিলিটারি ক্যাম্প। ধীরে সুস্থে চার দিক থেকে গ্রেনেড ফাটিয়ে এম্বুশ হয়। চরম পুলকের ক্লাইম্যাক্স এর সময় টায় ক্যাপ্টেনের ডান হাত উড়ে যায়। এক ঝাক স্প্লিন্টারের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত মায়া হাসতে হাসতে চোখ বন্ধ করে। দীর্ঘদিন নিরস্ত্র মানুষ হত্যা করতে করতে আর ধর্ষণে ব্যস্ত থাকায় রাজাকার আর বাকিরাও কেমন যুদ্ধ ভুলে গেছে। তারা প্রতিরোধ করতে গিয়ে মারা পরে।

৮ বছরের রাজাকার ইসমাইল কে মুক্তিবাহিনী বাচ্চা বিবেচনা করে ছেড়ে দেয়। সে এক দৌড়ে তালুকদার বাড়ি যায়, তার মা সে বাড়ির ঝি।

খবর পেতেই জাহানারা মাথায় হাত দিয়ে বসে পরে। তার মেয়ে জেসমিন কে শক্ত করে ধরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকে। মুস্তাফিজ, আজাদ, রহমান যখন দরজা ধাক্কাচ্ছে, সে হুড়মুর করে গিয়ে তাদের পায়ে পরে। তার আর তার মেয়ের ইজ্জৎ যাতে মুক্তি রা নষ্ট না করে, সে তাদের মায়ের মত। তার কোন দোষ নেই, সব তালুকদারের কাজ।

ঘৃণায় এক দলা থু থু ফেলে মুস্তাফিজ। ছিঃ, কি কুৎসিত চিন্তা এই মহিলার। রাইফেলের আগা মাথায় ধরে মুস্তাফিজ তাকে বলে, আমরা মুক্তিযোদ্ধা, পাকিস্তানি না।আমরা মেয়েদের অসম্মান করি না।

(তার আর পর নেই। নারীহত্যা করে নি মুক্তিযোদ্ধা রা। তবে এই ৪৬ বছর পর ইসলামি শিবির ছাত্রী সংঘটন বলে এক সংঘটন স্বাধীন বাংলাদেশে দেশে আছে। তারা জাহানারার মত বুদ্ধিমতী, স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত।)

লেখিকার স্বামী

ইয়াকুবের সংসারে আর আগের মত শান্তি নাই। দুশ্চিন্তায় তার প্রেসার স্বাভাবিকের চেয়ে বাড়তি হয়ে যাচ্ছে প্রায়ই।

ইয়াকুবের বয়স ৪৮, সে বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী । তার প্রথম স্ত্রী মমতাজ বছর ছয়েক আগে একদিন হঠাৎ করে হার্টফেল করে মারা যায়। , দুই ছেলের বয়স তখন একজনের ৪ আরেকজনের ৬। তখন সে ডিভি ভিসা তে আমেরিকা তে। মমতাজের আকস্মিক মৃত্যু তে শোক থেকে বড় সমস্যা দেখা দেয় ঘর গৃহস্থালি সামলানো। তার মায়ের কাছে এ নিয়ে কান্নাকাটি করতেই, তার মা একই গ্রামের সাদিয়ার সাথে দ্রুত বিয়ে ঠিক করে ফেলেন।

ইয়াকুব ২ পুত্র সহকারে বিবাহের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ গমন করেন। ইয়াকুবের মা অতি বিচক্ষণতার সাথে পাত্রী বাছাই করেছেন। পাত্রী ডিগ্রী সেকেন্ড ইয়ার, দেখতে শুনতে বেশ। মমতাজের থেকে তার গায়ের রঙ পরিষ্কার। সাদিয়ার বাবা মারা গেছে বলে তারা উপযুক্ত পাত্র পাচ্ছিল না। বিনাপয়সায় মেয়ে গছাতে পেরে তারা বেশ আনন্দিত।

সাদিয়া মেয়ে ভাল। কাজেকর্মে অত পটু না হলেও তার ছেলেদের দেখেশুনে রাখে। ইয়াকুব এতেই খুশি। তবে খুশি সে তেমন প্রকাশ করে না, বরঞ্চ ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দেয় দায়িত্বের সাথে। , প্রথম বিয়ের অভিজ্ঞতায় দেখেছে, নতুন বউকে বেশি আদর সোহাগ দিলে সে স্বামী কে ইয়ার দোস্ত ভাবা শুরু করে। পরে আর শাসনে কাজ হয় না, স্বামী এক ধমক দিলে বউ দেয় তিন ধমক।

আগের বিয়ের অভিজ্ঞতা সে অতি বিচক্ষণতার সাথে কাজে লাগায়। মমতাজ একেবারেই হিসেবি ছিল না। সাজগোজ করবে, বেড়াবে, এই কিনবে, ঘর সাজাবে, একে তাকে উপহার দিতে চাইবে, সংসারে সঞ্চয় বলতে কিছু থাকত না। মাঝেমধ্যে মা যদি অতিরিক্ত কিছু চাইত, দেয়ার মত টাকা হাতে থাকত না। গ্রামে জমি কিনবার সুযোগ হয়েছিল দু তিন বার। প্রতিবার ই হাত খালি। এমন কি ঘরের পাশের যে শরিকের জমি বেচল চাচা, সেটাও হাতছাড়া হয়ে গেছে। সবাই তাদের নিয়ে হাসাহাসি, আমেরিকা থাকা পোলা ২ লাখ টাকার জমি কিনার মুরোদ নাই।

সাদিয়াকে তাই সে কোন আলাদা হাতখরচ দেয় না। মাঝেমধ্যে বাজার করতে ২০-৫০ ডলার দেয়। সেটার হিসেব ও রাখে। এই প্রবাসী বউগুলির শখের শেষ নাই। তাদের খালি দেশে এটাসেটা দিতে মন চায়, যেন ডলার গাছে ধরে আর কি।

সাদিয়া একটু সহজ সরল ধরনের। তাকে যা বলা হয় তাই করে। সে সাজগোজ করে এটা ইয়াকুবের পছন্দ না, অল্পবয়সী মেয়ে, চোখেচোখে রাখা দরকার। তাই বলে দিয়েছে তুমি সাজলে বিশ্রী লাগে। সাদিয়া সাজে না। বোরখা কিনে দিয়েছে, পর্দা ফরজ মুসলিমের জন্য এই বলে।

বছর ঘুরতে সাদিয়া সন্তান সম্ভবা হল। ইয়াকুব খুশিই হল। যাক, এবার নিশ্চিন্ত। মেয়ে হল, পুরোপুরি বাধা পরল সাদিয়া । মমতাজের ছিল দুই ছেলে। সাদিয়া পুরো সংসারে জড়িয়ে গেল।

মেয়ের বয়স যখন ৮ মাস, তখন সাদিয়া যেন কেমন হয়ে যায়। সারাদিন খিটখিট, খাওয়াদাওয়ায় রুচি নেই, কি হয়েছে কে জানে। ডাক্তারের কাছে নেয়ার পর ডাক্তার টেস্ট করে দেখল সাদিয়া দুইমাসের প্রেগন্যান্ট। ইয়াকুবের মাথায় হাত। আবার বাচ্চা? নাহ, কিছুতেই না। তার দুইছেলের কি হবে? সাদিয়া নিশ্চয় ই নিজের বাচ্চা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাবে। চারটা ছেলেমেয়ে পালার খরচ ও ত কম না। তার বয়স হয়েছে, অতিরিক্ত কাজ বা খাটুনি সে নিতে পারবে না। হাইপ্রেসার ধরেছে কিছুদিন আগে। এই বাচ্চা এবর্শন করিয়ে ফেলতে হবে।

একটু ইতস্তত করে সে সাদিয়াকে কথাটা বলেই ফেল্ল। সাদিয়া হতবাক হয়ে ইয়াকুবের দিকে তাকিয়ে রইল। মৃদুস্বরে বললো, আমি বাচ্চা নষ্ট করব না।

- তুমি কিভাবে ৪ টা বাচ্চা দেখাশোনা করবে?

- পারব, সাথে তুমিও সাহায্য করবে।

- আমার পক্ষে এত খরচ টানা সম্ভব না, তুমিও ত চাকরী কর না।

সাদিয়া এবার অসহায় বোধ করে। আসলেই ত, সে ত চাকরি করে না। সে করতে চেয়েছিল, ইয়াকুব হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, এক অক্ষর ইংরেজি বের হয় না মুখ দিয়ে, তুমি করবে চাকরি। আর তাছাড়া ঘরের কাজ, বাইরের কাজ দুটো সামলে পারবে? আমি কিন্তু ছেলেমেয়েদের কোন অযত্ন সহ্য করব না।

তবু শেষ চেষ্টা করে, বাচ্চার জন্য ত আমরা ফুড স্টাম্প পাব। তোমার উপর চাপ হবে না।

- আচ্ছা, একগুঁয়ে মানুষ তুমি। আর খরচ নেই? আমি হাইপ্রেশারের রোগী। মরে গেলে এই চার বাচ্চা নিয়ে ভিক্ষা করতে হবে তোমার।

এরপর আর কথা চলে না। রাজি হয়ে যায় সাদিয়া। দুদিন পর ই ডেট পেয়ে যায়। অপারেশন এর আগে নার্স বারবার জিগেস করে, সাদিয়া সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় এবরশন করাচ্ছে কি না। সে চাইলে বাচ্চা রাখতে পারে।

সাদিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে সাইন দেয়, সে কারূ প্ররোচনা, হুমকি তে প্রভাবিত না হয়ে সম্পুর্ণ সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় এবর্শন করাচ্ছে।

তেমন কষ্ট ও হল না, ডাক্তার হাতে স্যালাইন দিল। হাসিমুখে বললো, তোমাকে অজ্ঞান করছি। এরপর আর কিছু মনে নেই তার। শেডিয়া শেডিয়া শুনে জেগে উঠল, ট্রলি তে ঠেলে এনে রিকভারি রুমে রাখা হলে আচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে রইল ঘন্টাখানেক।। দু ঘন্টা পর ইয়াকুব মেয়ে রুমাইসা কে নিয়ে এল। রুমাইসা ঝাঁপিয়ে পরল সাদিয়ার কোলে। সাদিয়া রুমাইসা কে নিয়ে পাথরের মত বসে রইল, কিচ্ছু বললো না।

নার্সের কাছে খবর নিল, সব ঝামেলা ঠিকঠাক মিটেছে কি না। নার্স হ্যা বলাতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সাদিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললো, চল, বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নেবে। বোরখা আর হিজাব পরে নেয় সাদিয়া। ইসলাম তার জন্যে প্রযোজ্য, ইয়াকুবের জন্যে না। এবর্শন যে মানুষ হত্যার মত পাপ, এটি ইয়াকুব না জানার ভান করে।

বাড়ি ফিরে দেখল, সব পরিপাটি। ইয়াকুব গুছিয়ে রেখেছে সব। রাজিব সজীব কেও বলে দিল মা কে বিরক্ত না করতে।

সাদিয়ার কিছুই ভাল লাগে না। ইচ্ছে করে চিৎকার করে সবাইকে বলে তার সন্তান কে হত্যার কথা। ইয়াকুবের এই রেসপন্সিবল ফ্যামিলিম্যান মুখোশ টা খুলে দেয়। জানোয়ার কোথাকার। প্রায়ই সে কাঁদে, পেটে হাত বুলায়, দুঃস্বপ্ন দেখে তার বাচ্চা করুণ চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। রাজিব সজিব মাঝেমধ্যে জিগেস করে কি হয়েছে তার, ইচ্ছে হয় গল্পের সৎমায়ের মত ছেলেগুলির উপর অত্যাচার করে। এরা ইয়াকুবের সন্তান বলে বেঁচে গেছে, তার সন্তান টিকে হত্যা করা হয়েছে।

ইয়াকুবের যে খারাপ লাগে না, তা না। অসুবিধে ও হচ্ছে, সাদিয়া কে যখনতখন কাছে পাওয়া যায় না। এক সাথে ঘুমাতে গিয়ে গায়ে হাত দিলে ছিটকে সরে যায় সাদিয়া। আচ্ছা, মুশকিল ত।

একদিন ইয়াকুব অবাক হয়ে দেখল, সাদিয়া ফেসবুকে গল্প লিখেছে। তার নানীর আমলের বিয়েশাদীর গল্প। ইয়াকুব পুরাটা পড়েও দেখে নি। যাক গে, লিখুক গে। ফেসবুকে গল্প লিখতে ত আর পয়সা লাগে না। এমনিতেই বেচারির কোন শখ আহলাদ নেই।

এরপর সে প্রায় ই লিখে, আমেরিকার গল্প, গ্রামের গল্প, তার বাপের দুই বিয়ের গল্প, শাশুড়ির গল্প। ইয়াকুব পড়ে দেখে না, মেয়েমানুষ আর কি গল্প লিখবে, মেয়েলি সব ব্যাপার নিয়ে প্যানপ্যান। তবে কমেন্টে লক্ষ্য রাখে, কোন লুইচ্চা আবার কি করে তার ঠিক নেই। সাদিয়া মেয়ে ভাল কিন্তু খুব সোজাসরল, নয়ত সে কি আর ইয়াকুবের মুঠিতে থাকে? তবে কি না কল কাঠি দেবার লোকের ত অভাব নেই। সাদিয়ার ফ্রেন্ডলিস্টে ছেলে কম, মেয়ে বেশি। সে ভাল। একদিন অবশ্য সাদিয়ার একটা লেখা পড়ে চমকে গেল। একটা মেয়ের স্বামী কে নিয়ে

লেখা গল্প। স্বামী সাজগোজ পছন্দ করে না, তাকে সুযোগ পেলেই বকা দেয়, এ জাতীয় গল্প, কি সর্বনাশ।

একদিন সাদিয়া কে ডেকে বললো, এসব কি লিখ? স্ত্রী হিসেবে যদি তোমার যদি কোন অভিযোগ থাকে, সেটা আমাকে বলবে। ফেসবুকে শুনিয়ে ত লাভ নেই। তোমার স্বামী খারাপ হলে তোমার নিশ্চয় তাতে সম্মান বাড়ে না। লোকে তোমাকেই খারাপ বলবে।

লেখালেখি করতে চাও, ভাল কথা। তা বলে এমন কিছু লিখবে না, যাতে আমার ছোট হতে হয়। ভাল ভাল বিষয় নিয়ে লিখবে, যাতে সমাজ সংসারে শান্তি আসে। আজকাল ত অনেকের বই বের হয়, তোমার লেখা দরকার হয় প্রকাশক কে টাকা দিয়ে ছাপিয়ে দিব। স্ত্রীর লিখালিখি তে বাধা দেব, এত ছোটলোক আমি না।

সাদিয়া মাথা নাড়ে। ইয়াকুবের ভারি রাগ হয়, ভাব দেখায় বেকুবের মত, এদিকে পেটে জিলাপির প্যাচ। যত্তসব।

ইয়াকুব অবশ্য এখন সাদিয়ার লেখার উপর চোখ রাখে, গল্পটল্প পড়তে তার কোন কালেই ভাল লাগে না, তবু নিজের সম্মানের জন্য দেখে রাখতে হয় । সেদিন জুম্মার নামাযে, রিপন মিয়া জিগেস করেছে, ভাবি যে গল্প গুলি লিখে তার নায়ক আপনি না কি? ভাবির মনে দেখি অনেক দু:খ। খেয়াল টেয়াল কইরেন উনার দিকে। আজকালকার মেয়ে, তাও আবার আপনার দ্বিতীয় পক্ষ। রাগে গা জলে গেল ইয়াকুবের, কপাল খারাপ না হলে কারু বউ ফেসবুকে লিখালিখি করে?

তবে সাদিয়া বিপজ্জনক কিছু এখনো লিখছে না। তবে তার লিখার নিচে কিছু ফাজিল মহিলার কমেন্ট দেখা যায়। দেশে এ এক নতুন ফাইজলামির চল হয়েছে, নারীবাদিতা। নিজের ঘর সংসারের ঠিক নাই, ঘরের কাজকাম রান্নাবাড়ার

খবর নাই, গিয়ে অন্যের ঘরের মেয়ে বউদের উস্কানি দাও। পর্দার দরকার নাই, বেলেল্লাপনা কর, স্বামীর সাথে টক্কর দাও।

বে** মা** গুলা। আবার ওইদিন সাদিয়া কি এক লেখা শেয়ার দিয়েছে জরায়ুর স্বাধীনতা, কতবড় বেহায়া আর বেয়াদব। তার সাদাসিধে বউ টা বিগড়ে দেবে এরা, সংসার ভাংতে চায় এরা।

অনেক সহ্য করেছে ইয়াকুব, আর না। সাদিয়া কে ডেকে শক্ত করে বলেছে,

শুন, আমি দ্বিতীয় বিবাহ শখে করি নাই, বাচ্চাদের জন্য করছি। আমি আমেরিকান সিটিজেন। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, মডেল কন্যা যাই বিয়া করতে চাইতাম, পারতাম, করি নাই কারণ আমার দরকার ঘরের বউ। যে রাঁধবে, স্বামীসোহাগ করবে, ঘরসংসার ঠিক রাখবে। মফস্বলের মেয়ে এই জন্যে বিয়া করি নাই, সে ফেসবুকে লিখবে, আর তার নারীবাদী বন্ধুবান্ধবের কথা শুনে সংসারে অশান্তি করবে।

আমি কখনো তোমার গায়ে হাত তুলছি না খাওয়াপরার অভাব রাখছি? কিসের অভিযোগ তোমার? তুমি আর ফেসবুকে লিখতে পারবা না, কোন লিখালিখিই করবা না। আমার অবাধ্য হলে সোজা দেশে পাঠায় দিব। দ্বিতীয় বিয়ে যখন করতে পারছি, তিন নম্বর হবার মেয়ের ও আকাল পরে নাই।

আড়চোখে তাকিয়ে দেখে সাদিয়ার মধ্যে তেমন ভয় নেই। সাহস ভালই বাড়ছে তার, ডোজ বাড়াতে হবে। ইয়াকুব নরম গলায় বললো, সাদিয়া, তুমি খুব ভাল মেয়ে। তুমি ভাল রানতে পার না, ঘর গুছাইতে পার না, এই নিয়ে আমার কোন অভিযোগ নাই। আমি সাহায্য করব। কিন্তু দেখ, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য সব সংসারে হয়, সেগুলি নিজেরা মিটাইতে হয়। তোমার আমার মধ্যে কোন

মনোমালিন্য ও নাই। হঠাৎ, সাদিয়ার হাত চেপে ধরে ইয়াকুব, আমি সত্যিই তোমারে অনেক ভালবাসি। কোন দিন বলি নাই, কিন্তু তোমার মত লক্ষ্মী বউ আর কারু নাই। বউ, আমাদের ছেলেমেয়ে গুলির দিক তাকায়া এই লেখালেখির জিদ ছাড় বউ। অন্য কিছু কর, আমি বাধা দিব না। উল্টা সাহায্য করব। প্লিজ বউ। ইয়াকুব কেঁদেই ফেলে।

সাদিয়া তাকিয়ে থাকে, লেখালেখি টাও ছাড়তে হবে তাহলে। লিখতে গিয়ে সংসারে অশান্তি সে করবে না। তবু এভাবে বাচতেও সে পারবে না। কিছু ত করতেই হবে। সে বেকার বলেই তার পেটের সন্তান কে হত্যা করা হয়, কলম কিবোর্ড কেড়ে নেয়া হয়। ধর্মের ভয় দেখিয়ে বোরখা মুড়িয়ে বাইরের পৃথিবীর স্বাধীনতার আনন্দ লুকিয়ে ফেলা হয়।

মৃদুস্বরে বললো, আমি পড়াশোনা করতে চাই। ছোটখাটো জব করতে পারব এমন পড়াশোনা।

- অবশ্যই করবা। আমি কালকেই জামির ভাইয়ের সাথে কথা বলে তোমার পড়ার ব্যবস্থা করব। খুশিমনেই করব। তুমি জব করলে আমারো সাহস। হায়াত মউতের ত ঠিক নাই। ছেলেমেয়ে গুলিকে দেখে রাখতে পারবা, রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে না।

সাদিয়ার একটু বুক কেপে ওঠে। যত খারাপ ই হোক, লোক টার দীর্ঘায়ু চায় সে। শান্ত গলায় বলে, ভাত দিব? রাত হয়ে গেছে।

- দাও। একটা ডিম ভাজি কইর পারলে। ইয়াকুব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

রুমাইসা এখন ধরে ধরে হাটতে পারে। সে দেয়াল ধরে হাসিমুখে মা মা করতে করতে সাদিয়ার দিকে এগুতে থাকে। সাদিয়া কোলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে

ধরে তাকে। তার মেয়ের নিশ্চয় আরেকটু বেশি স্বাধীনতা থাকবে। অবশ্যই থাকবে, মা হিসেবে সে তা নিশ্চিত করবে।

সাদিয়া আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করে। রাতের দুরত্ব ও কমে আসে। সাদিয়া সতর্ক হতে চায়, ইয়াকুব বলে আরে ধুর কিছু হইব না। তুমি বেশি ডরাও। বাচ্চা কি কলের পানি নাকি? ট্যাপ খুল্লেই আইসা পরব? নিজের রসিকতায় হাসে ইয়াকুব। ঘেন্না লাগে সাদিয়ার। তবু কিছু বলে না।

তবে কলের পানির মতই সহজে আবারো প্রেগন্যান্ট সাদিয়া। ইয়াকুব বিরক্ত মুখে ডাক্তারের কাছে যায়, সাদিয়া চুপচাপ কাগজে সাইন দেয়। এবর্শন ও হয়ে যায়। তার ডাক্তার কিছু উপদেশ দেয়, বিরক্ত মুখে হু হা করে সে।

শেষবার সাদিয়াকে হাসপাতালে রেখে বাড়ি চলে আসে ইয়াকুব, তিন চার ঘন্টার মামলা, সাদিয়া একাই পারবে। হাসপাতালের সামনে থেকেই বাস ছাড়ে, একটু হাটলেই হয় আর কি। সাদিয়ার শরীরের যন্ত্রপাতি জানি কেমন, এত বাচ্চা কেমনে আসে পেটে আল্লাহ জানে।

তিনবার এবর্শনের মেডিকেল হিস্ট্রি দেখে ডাক্তার এবার সাদিয়াকে পিল ধরিয়ে এর নিয়ম কানুন সব বুঝিয়ে বলে দেয়।

এবার আর বাচ্চা আসে না। তবে ইয়াকুবের একটু খুতখুত লাগে। পিল খেয়ে কেমন মুটিয়ে যাচ্ছে সাদিয়া, বিরক্ত গলায় তোমারে দেখতে ত আমাত্তে বুড়া লাগে। ১৮ বছরের ছোট তুমি আমার। ওজন কমাও।

সাদিয়া রাতে ভাত খাওয়া বন্ধ করেছে। এত সামান্য বিষয় নিয়ে ভাল মেয়েরা অশান্তি করে না। লেখাও বন্ধ। এই একটাই ত জীবন, রেঁধে বেড়ে

বাচ্চাকাচ্চা বড় করতে করতে দিব্যি কেটে যাবে, যাচ্ছেও। মেয়েরা চাওয়াপাওয়ার হিসেব করলে পৃথিবী তে সংসার গুলি টিকে থাকত না।

গল্প #হাওয়াবদল

অফিসের একটা লোন স্যাংশানের পেপারস নিয়ে ভিজিটরস চেয়ারে বসে আছে মামুন । ম্যানেজার সাহেবের সাথে আগেই কথাবার্তা হয়ে গেছে বসের। ফর্মাল পেপার ওয়ার্ক করতেই সে এসেছে। ম্যানেজার সাহেব একটু ব্যস্ত আছেন, তাই অপেক্ষা করছে মামুন ।

অপেক্ষা করতে তার খারাপ লাগছে না। হঠাৎ পাওয়া অবসর টুকু তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছে সে। তার বয়স ৪১, বিবাহিত এবং দুই সন্তানের বাবা। বাইরে বেশ গরম, এই অফিসের এসির বাতাস টা খুব আরামদায়ক। বেশ শান্তি লাগছে তার।

বাড়িতে মা, এবং আর ছোট বোন সহকারে তার বসবাস। বড় ছেলে বলে কথা, অফিস, বাজার, বাচ্চার দেখাশোনা, বাড়িভাড়া তোলা সব কিছুই তার দেখা লাগে। অফিস বা বাড়ি যেখানেই সে একটু অবসর কাটায়, আশেপাশের লোক সরু চোখে তাকাবে, সে কেন বসে আছে? অমুক ফাইল দেখছে না? বাচ্চার হোম ওয়ার্কে হেল্প করছে না? বোনের বিয়ের যে সম্বন্ধ এল, তার ব্যাপারে আলাপ করছে না কেন? একটু অবসরের জন্য আজকাল প্রায়ই মন কেমন করে তার।

বসে বসে অন্যদের ব্যস্ততা দেখে সে। কাউন্টারে দীর্ঘ লাইন, গ্যাস বিল, পানির বিল, প্রবাসীর টাকা উত্তোলন। একবার একটু হইচই, জাল নোট পাওয়া গেছে। ভাল করে তাকাতেই লাইনে একটা পরিচিত চেহারা দেখে একটু চমকে উঠল।

পেঙ্গুইন না? ঠিকই ত। আজ কতবছর পর পেঙ্গুইন এর সাথে দেখা। তার ভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট জুনিয়র। নাম অবশ্য আসলে পেঙ্গুইন না, মেয়েটির হাটার ভঙ্গী ছিল কিছুটা অদ্ভুত, তাই নিক নেম হয়ে গেছিল পেঙ্গুইন। এমনিতে, ডাক নাম নিতু।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্ল, মামুন । পেঙ্গুইন এর সাথে তার খুব মিষ্টি একটা প্রেম ছিল। গল্প উপন্যাসে নানা রকম নাটকীয় প্রেমের সুত্রপাত দেখা যায়। তাদের বেলায় এমন কোন গল্প নেই। দুইজন ই মিরপুর থাকত। ভার্সিটি যাওয়ার বাসের জন্য মিরপুর ১০ এর স্ট্যান্ড এ দাঁড়িয়ে থাকত, দুইজনের সময় মিলে গেলে, পেঙ্গুইন মিষ্টিসুরে বলত, স্লামালিকুম ভাইয়া, ভাল আছেন?

মামুন ভার্সিটির বড়ভাই সুলভ গাম্ভীর্য ধরে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে বলত, হ্যা, তুমি ভাল? সেমিস্টার ফাইনাল কবে?

এরপর বাসে উঠে গাদাগাদির মধ্যে তারা হারিয়ে যেত। বাস থেকে নেমে কেউ কাউকে চেনে না, এমন ভঙ্গী তে ডিপার্টমেন্ট চলে যেত। ওই ৩০ সেকেন্ড, ১ মিনিটের আলাপের জন্য তারা দুজনেই প্রতিদিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। প্রায় সময় ই দেখাও হত না। দুজনের ক্লাস ভিন্ন সময়ে, দুই আলাদা ক্লাসে।

মামুন আর নীতু দুজনেই খুব সাধারণ ধরণের। তাদের তেমন কোন আকর্ষণীয় চেহারা বা ব্যক্তিত্ব ছিল না। এ জাতের মানুষেরা টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত সংসারে জন্ম নিয়ে নিতান্ত ভ্যাতভ্যাতে জীবন কাটিয়ে এক সময় মরে যায়। ভার্সিটি তে তারা নিয়মিত ক্লাসে যায়, নোট নেবার বদলে ঝিমায়, তারপর ক্লাসের আতেল গোত্রীয় উদার কারু খাতা পরীক্ষার আগে ফটোকপি করে হতভম্ব হয়ে ভাবে এত পড়া কেমনে শেষ হবে? তারপর শর্ট সাজেশনের জন্য ছোটাছুটি।

এহেন মানুষদের প্রেমে পরতে তেমন কোন কিছু লাগে না। হালকাপাতলা আলাপ চলতে চলতে, মাঝেমধ্যে টং দোকানের চা খেতে খেতে তাদের প্রেম হয়, মামুন ভাই এক সময় মামুন হয়, অলিগলি তে দুজন ভুলে ভালে হাত ধরে, চুমু খেয়ে সারাদিন আতংকে থাকে, কেউ দেখল কি না, তাদের প্রেম বিয়েতে গড়াবে কি না।

সেই আতংকের দিনের কথা মনে করে মামুনের হাসি পেয়ে গেল। মাঝখানে পার হয়ে গেছে প্রায় ১৫ বছর। এখন সে রাস্তাঘাটে বেরুলে ভার্সিটির ছেলেপিলে রা আংকেল ডেকে বসে। আগে খুব চমকে যেত, এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। হ্যা বাপ, আমি আংকেল ই হই তোদের।

তবু পেঙ্গুইন কে দেখে পুরোনো দিনের মত বুকে রক্ত ছলকাচ্ছে। হঠাৎ এই চল্লিশে, ভার্সিটির টগবগে তরুণের মত নিতুর কাছে গিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে, নিতু ভাল আছ? তোমার সেমিস্টার কবে? এখন নিশ্চয় ই তার আর সেমিস্টার নেই, কি জিগেস করা যায় এর বদলে? বাসার সব ভাল?

অবশ্য দূর থেকে নিতু কে দেখতেও খুব ভাল লাগছে। যদিও পেঙ্গুইন এখন মুটিয়ে ফার্মের মুরগি হয়ে গেছে, তবু হাসিটা আর গলার স্বর টা এখনো একই রকম মিষ্টি আছে। ফোনে গল্প করলে কি এখন সেই রিনরিনে মিষ্টি স্বর শোনা যাবে?

নিজের বর্ধিষ্ণু উর্বর ভুড়িতে হাত বোলায় সে, সেও বুড়িয়ে যাচ্ছে। ক্লিন সেভ না করলে কাঁচাপাকা দাড়ি দেখা যায়। উঠে দাঁড়াল সে, নিতুর সাথে কথা বলবে সে, কতদিন পর এমন করে দেখা হল তাদের।

উঠে দাঁড়াতেই, ব্যাংকের পিয়ন এসে বললো ম্যানেজার সাহেব ডাকে আপ্পেরে। মামুনের ইচ্ছে হল বলে, তোমার ম্যানেজার কে বল অপেক্ষা করতে, আমি একটা জরুরী কাজ সেরে যাচ্ছি।

তা ত আর বলা যায় না, মামুন তৃষ্ণার্ত চোখে দেখে নিতু ব্যাগে রিসিট ভরে বের হয়ে যাচ্ছে। আহা রে। জীবনে কত কাজ ই যে করা হয় না।

ব্যাংকের কাজ, অফিসের কাজ, অফিস ফেরতা বাজার সব সেরে বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত ৮ টা বাজল। বাড়ি ফিরে ফ্রেশ হয়ে মামুন তার স্ত্রী কে বললো, এক কাপ চা হবে? আস, তুমিও এখন আমার সাথে এক কাপ খাও।

মামুনের স্ত্রী তার ছেলে কে পড়াতে বসেছে , আর তিন মাস পর পি এস সি পরীক্ষা। ক,খ, গ তিন জনের কাজ ১০ দিনে শেষ হয়, সে কাজ খ এর একা করতে কতদিন লাগবে, সে নিজেই এটা বুঝতে পারছে না, ফাহাদ কে বুঝাবে কি? একটা টিউটর রাখলে হয়, শাশুড়ি ননদ হাসাহাসি করে। অনার্স মাস্টার্স শেষ করে ক্লাস ফাইভের পড়া পড়াতে পারে না সে, সে নাকি আবার কলেজের লেকচারার ? মেজাজ প্রচণ্ড গরম হয়ে আছে তার, ৯ টার মধ্যে সবাইকে রাতের খাবার দিতে হবে, এর মধ্যে মামুনের এসব আহ্লাদী তে তার গা জ্বলে গেল। মুখ ঝামটে বললো, একটুপর ভাত খাবে এখন চা কিসের? আর এই অংক আমি বুঝতে পারছি না, তুমি দেখ। আমি ভাত বাড়তে যাই।

মামুন, কাতর গলায় প্লিজ, আজকে না, মাফ কর, খুব টায়ার্ড লাগছে। ঠাস করে ফাহাদের পিঠে কিল বসিয়ে দিল ওর মা, গাধা ছেলে কোথাকার, সব পড়া গিলিয়ে দেয়া লাগে।

- ওকে মারছ কেন? কি আশ্চর্য? ওর কি দোষ?

- বেশ করেছি মেরেছি। আমিই সব করব, আমিই মারব।

- হু, আমাদের ত আর মারতে পারে না, বাচ্চা ছেলেটার উপর সব রাগ ঝাড়ে। শাশুড়ি ও পাশ থেকে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন।

ঝড়ের পুর্বাভাস, আজ লেগে যাবে সুন্দে উপসুন্দে। সবাই যে যার পয়েন্ট এ ঠিক। মামুনের স্ত্রী অবশ্য জবাব দেয় না, দুম করে চেয়ার সরিয়ে উঠে নিজের ঘরে গিয়ে বসে থাকে। শাশুড়ি এমন বেয়াদবি তে ব্যথিত হন, মামুনের বোন সারা কে ডেকে বলেন, এই সারা, যা আজকে তুই ভাত বাড়, সারাদিন আছে টিভি সিরিয়াল আর ফেসবুক নিয়ে।

সারা মহাবিরক্ত হয়ে উঠে আসে, কি দেব? ভাত বাড়, দুপুরের তরকারি গরম কর, সালাদ কাট, লেবু দাও। সারা গজরগজর করে, মিছিমিছি ভাবিকে ক্ষেপিয়ে এখন সব কাজ তার ঘাড়ে এসে পরেছে।

অবশ্য এরপর মামুনের মা নিজেই সারার সাথে কিচেনে ঢুকেন, আজকালকার বউ গুলি এমন বেয়াদব। তারা কখনো শাশুড়ির সাথে এমন করতে সাহস পান নি। তার ছেলেটা হয়েছে তেমনি, বউ কে কিছুটি বলবে না।

মামুন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফাহাদের অংক নিয়ে বসল, এমন বদমেজাজ তার বউয়ের, আজকাল বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে হয় না। মুখে বললো, হ্যা লিখ, ক কাজটি শেষ করে ৭ দিনে, তাহলে এক দিনে করে --

ঘরে থমথমে পরিবেশ, ফাহাদের মা ফারজানার মেজাজ কিছু টা উগ্র। কলেজ থেকে এসে পরদিনের রান্না, সকলের খাওয়া পরিবেশন, বাচ্চাদের পড়ানো দিনের পর দিন একই কাজ, আর ভাল লাগে না তার। মাঝেমধ্যে মনে হয় চাকরি ছেড়ে দিবে কি না, কিন্তু ২৪ ঘন্টা এমন সংসারে আটকে থাকার মনে

হলে এক ধরনের আতংক হয় তার। ইচ্ছে করে সব ছেড়েছুড়ে কোথাও চলে যায়। মাঝেমধ্যে ইচ্ছে হয় আলাদা হয়ে যায়, কিন্তু মামুন বাড়ির এক ছেলে, শাশুড়ি আম্মা আর সারা কি একা থাকবে?

ডাইনিং টেবিলে সবাই নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে। নিতু বেডরুমে একা গুম হয়ে বসে আছে, তার খিদে পেয়েছে কিন্তু লজ্জায় খেতে যেতে পারছে না। খুবই বিব্রত লাগছে এমন সিন ক্রিয়েট করাতে। হায় সংসার, সে এরকম ছিল কখনো?

মামুনের মা অবশ্য একবার বললেন, ফারজানা কে খেতে বল, কলেজ থেকে ফিরে কিছু খায় নি। মামুন সংক্ষেপে বললো, দরকার নেই। এখন ডাকলেও আসবে না। রাগ কমুক আগে।

মামুনের মা একটা প্লেটে ফারজানার জন্য ভাত তরকারি বাড়তে লাগলেন, বাড়ির কেউ না খেয়ে থাকলে তার নিজেরই রাতে ঘুম হবে না । বিরক্ত হয়ে বললেন, তোর বউকে ডাক্তার দেখা। মাথা খারাপ না হলে কেউ এমন মেজাজ করে? বাচ্চা দুটোও ত খায় নি। সারা বললো, আমি খাইয়ে দেব, তুমি যাও। পাশের রুম থেকে এসব কথা শুনে রাগ আরো বেড়ে গেল ফারজানার। অবশ্য আর কিছু করল না, একাই ফুঁসতে লাগল।

ফাহাদ আর রুমাইসা আজ চুপচাপ, মা রেগে গেলে তাদের খুব ভয় করে। সারা বাচ্চাদের খাইয়ে দিয়ে টেবিল গুছিয়ে চলে গেল। বাচ্চারাও দাদুর পিছু নিল।

রাত বারটায় সবাই ঘুমিয়ে গেছে। মামুন আস্তে আস্তে ফারজানা কে ডাকে, নিতু, এই নিতু।

ফারজানা অবাক হয়, অনেকদিন এই নামে তাকে কেউ ডাকে না। মা, বাবা ডাকত। তবে সাড়া দেয় না। কি মিষ্টি একটা নাম ছিল তার।

মামুন আবার ডাকে, এই পেঙ্গুইন। এবার কাজ হয়, ঝট করে উঠে বসে সে। এই, কি বললে? একদম ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। তোমাকে যে সবাই চালকুমড়া ডাকত সেটা আমার মনে নেই ভেবেছ?

হো হো করে হেসে ফেলে মামুন। ওকে পেঙ্গুইন, আমি চালকুমড়া ই সই। এখন কি তোমার রাগ কমেছে? ভাত খাবে চল।

- না, কিছুতেই না।

- রাতে ঘুম হবে না তোমার। খিদেয় মাথাব্যথা করবে সকালে। উঠ এখন।

- না।

- এখন কিন্তু কোলে করে নিয়ে যাব।

- ইস, এলেন আমার শাহরুখ খান। শেষে কোমর ভাংবে।

- পারব না ভেবেছ? নিতু কে জড়িয়ে ধরে মামুন, নিতু আতকে উঠে।

- থাক, থাক উঠছি। এত ঢং জান তুমি। ঢং বাদ দিয়ে একটু হেল্প করলেই হয়। মুখে বলে না, এই ঢং তার খুব ভাল লাগছে। নিজেকে কেমন নতুন বউয়ের মত মনে হচ্ছে।

মামুন মিটমিট হাসে, ভার্সিটির সেই বিচিত্র সময় যেন আজ ফিরে এসেছে, নিতু মুখ ঝামটালেও বেশ লাগত, রাগ ভাংগাতে নতুন নতুন উপায় বের করার চ্যালেঞ্জ নিতে বেশ লাগত তার।

ভাত ঠান্ডা হয়ে গেছে একেবারে। তবু নিতু আগ্রহ করেই খায়। মামুন মনোযোগ সহকারে দেখে । নিতুর সাথে খেতে বসা হয় না অনেকদিন , ওইসময়

বাচ্চাদের খাওয়ায় সে। তারপর বাচ্চাদের এটোপ্লেটেই সব এক সাথে নিয়ে দ্রুত খাওয়া শেষ করে।

- বেড়াতে যাবে, পেঙ্গুইন? নীলগিরি?

ম্লান হাসে নিতু। এখন কিভাবে? বাচ্চারা কার কাছে থাকবে? ওদের স্কুল ও খোলা।

- ওদের মার কাছে রেখে যাব। চল না নিতু, আমি খুব মিস করছি তোমাকে। এক ছাদের নিচে ১৫ বছর কাটালাম, তুমি একেবারে পালটে গেছ। সেই আলাভোলা পেঙ্গুইন থেকে খাণ্ডার ফারজানা ম্যাডাম। চল, দুইটা দিন আগের মত কাটাই।

- মা কে কি বলবে? উনি কি মনে করবেন?

-বলব তোমার মেজাজ নিয়ে ডাক্তারের সাথে কথা বলেছি, ডাক্তার বলেছে তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যেতে। শুধু তুমি আর আমি। নয়ত, তুমি সত্যিই পাগল হয়ে যাবে।

খাওয়া বন্ধ করে চুপ হয়ে যায়, নিতু। তুমি আসলেই ডাক্তারের কাছে গেছিলে আমার জন্য, তোমার ধারণা আমার চিকিৎসা দরকার? অপমানে চোখে পানি এসে পরে নিতুর।

- একি খাওয়া বন্ধ করলে কেন? না রে বাবা, ডাক্তারের কাছে যাই নি, অত সময় কই?

- তাহলে আচমকা এ প্রস্তাব কেন?

- আচ্ছা সন্দেহ বাতিক গ্রস্ত মহিলা ত তুমি। আজকাল টিভি সিনেমায় এমন দেখায়, সেই জন্য বললাম।

- কোন সিনেমায় এমন দেখিয়েছে?

মামুনের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। থাক, যেতে হবে না কোথাও, ঘরে বসে খিটখিট করে সবার জীবন অতিষ্ঠ কর। সে উঠে বেডরুমে চলে যায়।

টেবিল গুছিয়ে হাত ধুয়ে বিছানায় আসে নিতু।

- এই শুনছ? ঘুমিয়েছ?

মামুন মটকা মেরে পরে থাকে।

- মিছিমিছি ঘুমের অভিনয় কর না, মামুন সাহেব। অভিনয় ভাল হচ্ছে না, ঘুমালে তুমি নাক ডাক।

- হ্যা, আমার ত কিছুই ভাল না, ঠিকই ত মানুষের সাথে হেসেহেসে কথা বল। আমাকে দেখলেই কেবল মুখ ঝামটাও।

- আমি আবার কখন কার সাথে হেসে কথা বললাম?

- তুমিই ভাল জান।

- এই, তুমি আমাকে সন্দেহ কর? ঝেড়ে কাশ।

- মহা ঝগড়াটে মহিলা ত তুমি। ঘুমাতে দেবে কি না? সকালে অফিস আছে।

- কোন ঘুম নাই, আমি কার সাথে হেসে কথা বলি, এক্ষণ বলবে।

মামুন আর কথা বাড়াল না। ঝুপ করে নিতু কে জড়িয়ে ধরে চুমু দিয়ে আটকে ফেল্ল। নিতু হাচোড়পাচোর করতে করতে হঠাৎ থেমে গেল। আজকের স্পর্শ টাই যেন কেমন অন্য রকম, ভালবাসা মাখা, তাদের ১২ বছরের পুরোনো জরাজীর্ণ, দায়পড়া সম্পর্ক না। নিতু মামুনের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, তোমার কি হল বলত? আমাকে আজ নতুন পেলে না কি?

- হু, নতুন পেয়েছি। তরুণী নিতু, পেংগুইন নিতু। সোশিয়লজি, ২য় বর্ষ। উ, উ কি কর? এমন সময়ে কেউ চিমটি দেয়?

- ভাবলাম, স্বপ্ন দেখছি নাকি? আধবুড়ো বয়সে এত রস এল কোত্থেকে?

- যাও, তোমাকে দিয়ে হবে না। গতকাল অফিসে ইন্টার্ভিউ ছিল। সুন্দর একটা মেয়ে এসেছিল, তোমার বান্ধবী মনীষার মত দেখতে, বয়স ২৩-২৪। দেখি ওকেই রিক্রুট করব, ইন্টার্ভিউ বোর্ডে সালাম দিল, স্লামালিকুম, স্যার । একদম তোমার সাথে পরিচয় হবার সময়ের মত।

- চরিত্রহীন কোথাকার, তোমার মত মানুষদের জন্য মেয়েরা জব করতে পারছে না।

- ওকে, ফেমিনিস্ট পেংগুইন। এখন বল, নীলগিরি যাবে?

- হ্যা, যাব। কবে যাবে? আগামী বৃহস্পতিবার? শুক্র, শনি দুই দিন থাকব?

- ঠিক আছে। দেখি, রুম বুকিং দিয়ে দেব।

- আচ্ছা। এই, নীল গিরি দেখতে কেমন?

- কি জানি, আমিও ত যাই নি কখনো। শুনেছি অনেক উঁচু পাহাড়ের উপর বাংলো বাড়ি। মেঘলা দিনে মেঘ ধরা যায়।

দুজন আরো কিছু সময় ধরে সেই আশ্চর্য স্বপ্নের কথা বলাবলি করে। পরের সপ্তাহ অবশ্য যাওয়া হয় না, ঠিক হয় বাচ্চাদের পরীক্ষার পর যাওয়া হবে। তারা আদৌ যেতে পারবে কিনা, কে জানে ?

তবে, মামুন প্রায়ই পথেঘাটে নিতু কে খুঁজে বেড়ায়। তার সেই আটপৌরে স্ত্রী কে মাঝেমধ্যে অপরিচিত লোকের মত লুকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে, কেন করে, কে জানে।

নিতু ও আজকাল আগ্রহ নিয়ে মামুনের ঘরে ফেরার অপেক্ষা করে। সেইসব রাতে, মাঝেমধ্যে যখন তার নিত্যপরিচিত স্বামী হঠাৎ প্রেমিক হয়ে ওঠে, সে সময় টা তার বেঁচে থাকতে খুব ভাল লাগে।

আইফোন ৩

সজিবের সাথে আমার দেখা হয়েছিল টিএসসি তে। আমার এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে এসেছিল। সদ্য বিদেশ ফেরত, হাতে আইফোন ৩। সময় টা ২০০৭। আমার দেখা কিপ্যাড বিহিন ফোন সেটাই প্রথম, আমি টেক্নোলজির অত খবর রাখতাম না। একটা মাত্র বাটন দিয়ে কিভাবে ফোন চালায়, সেটাই বিস্ময় ছিল আমার কাছে।

সজিবের বিস্ময় ছিলাম আমি। পয়লা ফাল্গুনের উৎসব। বাসন্তী শাড়ি, হাতভর্তি কাচের চুড়ি, খোপার ফুল অথবা তরুণী আমি- মুগ্ধ করেছিল তাকে। মুগ্ধতা কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল, আমার ফোন নম্বর যোগাড় করে ইনিয়েবিনিয়ে জানাতে লাগল সে আমায় ভালবাসে। তা বাসুক না। ওই পজিশন টা ভ্যাকেন্ট ই ছিল। শুভাকাঙ্ক্ষী বান্ধবী রা সতর্ক করল, এসব ছেলেরা বিদেশ থেকে এসে পার্টটাইম গার্লফ্রেন্ড খুঁজে। ফাদে পা দিস না। আমি দিলাম ও না। তবে ফোন করলে গল্প করতাম। ভক্তিবন্দনা পেয়ে নিজেকে দেবীই মনে হত।

সজিবের মুগ্ধতা আর কাটল না। বিয়ে করার জন্য অস্থির হল। এমন ভাব, যেন আমাকে বিয়ে করে গৃহদেবী প্রতিষ্ঠা করবে। ওহ, কি দামী ই না ছিলাম আমি।

বাসায় ফরমাল প্রপোজাল এল, টিপিক্যাল ফ্যামিলির মত আমার পরিবার গাইগুই করল, তাদের ঢাকা ভার্সিটি পড়ুয়া মেয়ের জন্যে ডাক্তার - ইঞ্জিনিয়ার - বিসিএস ক্যাডার চাই। বিদেশের ওসি ডিসির কাছে মেয়ে দেবে না। ভাববার বিষয় বটে। তবু পরিবারের দু চারটা এরেঞ্জ ম্যারেজে দাম্পত্যকলহ দেখে মনে হল, ভালবাসার বিয়েটাই মনে হয় ভাল হবে। বায়োডাটার সাথে কি মনের মিল হয়?

বাবা মা মেনে নিলেন। মোটামুটি সমারোহে বিয়েও হল। বিদেশ এলাম। দুবছর পার হয়ে গেছে এই করতে করতে। এখানকার মার্কেটে স্যামসাং গ্যালাক্সি এসেছিল তখন, আগ্রহ করে কিনে ফেল্ল সজিব।

সব গুছিয়ে উঠতে চার বছর লেগে গেল। আমি এখানের একটা রিটেল শপে, শপ এসিস্টেন্টের কাজ করতাম। ভালই চলে যেত দুজনের। ছুটির দিনে হলে সিনেমা দেখতাম আমরা। ছোট একটা এপার্টমেন্ট কিনলাম আমরা, ত্রিশ বছরের ইন্সটলমেন্ট। বাকি জীবন টা এখানেই কাটিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা। কি চাই আর। ধরণীর কোণে এত টুকু বাসা।

ইতিমধ্যে দুপক্ষের আত্নীয়রাই তাড়া দিতে লাগল। আমাদের মধুচন্দ্রিমা শেষ হয় না নাকি? বংশে বাতি দিতে হবে না? হবে বৈকি। আল্লাহ দিয়েও দিলেন। প্রেগ্নেন্সি থেকেই শুরু। যখনতখন বমি। খেতে গেলে গন্ধ লাগে। সজিবের সাথে আর এক সাথে খেতাম না। কেউ ওয়াক ওয়াক করলে খাওয়া যায়? রাতে

এপাশ ওপাশ ছটফট। সজীব পাশের ঘরে ঘুমাত, খুব ডিস্টার্ব হত ওর ঘুমের।সকালে কাজ আছে ত, না কি? শরীর খারাপ থাকায় আর জব কন্টিনিউ করা গেল না। কোনরকমে নয়মাস পার করলাম, ফুটফুটে একটা ছেলে হল আমার। হাফ ছেড়ে বাঁচলাম, বংশেরবাতি দিতে পেরেছি, নয়ত হাহাকার রয়েই যেত।

বাংলাদেশের কোন মা সাধারণত মুখ ফুটে বলে না, মা হওয়া টা আসলে কি ব্যাপার। কি ব্যাপার তা ত বুঝলাম, কষ্টের কথা কেন বলে না, তাও বুঝলাম। বললেই আরেকজন মা ই বলবে, হু আমি আর বাচ্চা মানুষ করি নি। মা হলে ওসব করতেই হয়। বাচ্চা কাঁদতে থাকে, খাওয়াতে গেলে ঘুমিয়ে পরে, ঘুমালে খিদেয় উঠে যায়। বিদেশ বাড়ি, সব কাজ আমার। সজিব মাঝেমধ্যে সাহায্য করে, মাঝেমধ্যে বিরক্ত হয়, কি করতে মা হয়েছ? কিছুই সামাল দিতে পার না?

খুব খিটখিটে মেজাজ হয়ে গেছে আমার। কত রাত ঘুমাই না, একটু চোখ বুঝে আসলে ছেলে টা কেঁদে উঠে। সজিব বিরক্ত হয়, কাঁদছে শুনছ না? থামাও না। সারাদিন কাজ শেষে বাড়ি এসে শান্তি নাই এক ফোঁটা।

কি যেন খুঁজতে গিয়ে ড্রেসিংটেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। এক মধ্যবয়সী মহিলাকে দেখলাম। বেঢপ মোটা, রংচটা ম্যাক্সি পরা, এ মা, কপালের কাছের চুল গুলি কি পেকে গেছে নাকি? কত বয়স হয়েছে আমার, বত্রিশ? অনেক নাকি? এই ত সেদিন ভার্সিটির র‍্যাগ ডে তে সবাই মিলে কত হইচই করলাম, এর মধ্যে বত্রিশ হয়ে গেল? কপাল ভাল, ছেলেটা কেঁদে উঠে রেহাই দিল, এ দৃশ্য সহ্য করা আসলেই মুশকিল। হু, ন্যাপি চেঞ্জ করে রান্না চড়াতে হবে। ডাল, মুরগি, করলাভাজি।

মাঝেমধ্যে সজিবের সাথে খুব ঝগড়া হয়, বাচ্চা লুক আফটার নিয়ে ঘরের কাজ নিয়ে, বাইরের কাজ নিয়ে,সংসার খরচ নিয়ে, আমার চাকরি টা ত আর নেই। সজিবের অসহ্য লাগে, বিরক্ত হয়ে বলে তুমি ক্রেজি। তোমার সাথে থাকা আর সম্ভব না। ছয়মাস সময় দিচ্ছি, সব গুছিয়ে নিয়ে আলাদা থাক। সিংগেল মাদার হিসেবে ভাল সাপোর্ট পাবে সরকার থেকে, আমাকে রেহাই দাও। আমি আর পারি না।

নিজেকে খুব ছোট লাগে। সাত বছর আগে যার কাছে দেবী ছিলাম, আজ তার কাছে মাটির পুতুলের চেয়েও ফেলনা হয়ে গেছি। খুব ভাবতে চাইলাম, সজিব একটা খারাপ লোক, তার মতামতে কিছু যায় আসে না, আই এম গ্রেট। আই উইল বি এন ইন্ডিপেনডেন্ট হিউম্যান বিয়িং। ছেলেকে নিয়ে একা থাকব, কাজ করব, স্বামী থাকতেই হবে এমন কোন কথা আছে? তবু আমার জালা একটুও কমল না, বিছানায় সারারাত জেগে বসে রইলাম।

তিন চার দিন পর সজিব আমার কাছে ক্ষমা চাইল। সে নিজেও নানাবিধ চাপে বিপর্যস্ত। আমি বোধহীন ভাবে তাকিয়ে রইলাম, কি বোধ করা উচিৎ সেই জ্ঞান আমার লোপ পেয়েছে। তবু পরদিন আবার সংসারের কাজ শুরু করলাম, যদ্দিন সংসার টিকে, করে যাই। মরা ছাড়া রেহাই নেই।

ঘর গুছাতে গিয়ে সেদিন এক ড্রয়ারে সেই পুরোনো আইফোন টা পেলাম। সাথে একটা পুরোনো এলবাম। আমার অনেক গুলো ছবি। বিয়ের পর বিদেশ আসার সময় সজিব নিয়ে এসেছিল, আমাকে না দেখে নাকি থাকতেই পারবে না। সেই পয়লা ফাল্গুণের বাসন্তী শাড়ি পড়া ছবি, বিয়ের জরোয়া সাজে, কক্সবাজারের হানিমুন, বিদেশে আসার প্রথম দিক কার ছবি , একটা ভেংচি কাটা

ছবিও আছে। তখন আমি আর আইফোন থ্রি - দুজনেই বেশ আরাধ্য ছিলাম। একটা জড়বস্তুর সাথে আমার কি আশ্চর্য মিল।

সজিব এখন অপ্পো রেন ফাইভ জি ব্যবহার করছে, আমি এখনো আছি। ফোনের মত বউ চেঞ্জ করা যায় না, এ কথা ভাবলে সজিবের প্রতি আমার বেশ মায়াই হয়।

বিরল পাপী

চুপচাপ এক জায়গায় বসে আছে এশা। আর কিছুক্ষণ, বা কয়েক ঘন্টা সময় আছে হাতে। এসময় অনেকের আত্নীয়স্বজন দেখা করতে আসে। মা বাবা, ভাই বোন। তার বেলায় আসার মত কেউ নেই।

জেলার সাহেব তাকে দেখে প্রায়ই বিব্রতবোধ করেন। ঘৃণা আর সহানুভূতির মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়ত এমনই। এশার অবশ্য এতে কিছু যায় আসে না। অনেক দিন ধরেই কিছু যায় আসে। কেন কোন কিছু তে তার যায় আসে না, সেটা যে একটা জাতীয় সমস্যা হয়ে গেছে তাও সে জানে না।

আচ্ছা, কবে থেকে সে এমন হয়ে গেল? ঠিক মনে করতে পারে না। তার বয়স কত? এই স্কুল সেই স্কুল করে করে সার্টিফিকেট এ তার বয়স দেখাচ্ছে ষোল। আসলে কত কে জানে?

কয়েক ঘন্টা কাটানো একটু সমস্যাই আসলে। অনেক দুরের ট্রেনের জন্য তিন ঘন্টা আগে স্টেশনে পৌছে গেলে যেমন হয়। পুরো জীবন টা রিওয়াইন্ড করার চেষ্টা করে। বিশ টা বছর ই ত।

ছোটবেলার কোন মিষ্টি স্মৃতি কি তার আছে? পাচ বছর বয়সে একবার খুব ধুমধাম করে জন্মদিন হল। মা পার্লারে জমকালো করে সেজেছিল। এশার মাথায় স্টোনের মুকুট, পরীর মত ফ্রক। অনেক ছোট ছোট বাচ্চাও এসেছিল। নিজেদের মত খেলছিল ওরা। নাহ, এশাকে কেউ খেলায় নেয় নি। আসলে কিভাবে অন্য বাচ্চাদের সাথে খেলতে হয় তাই জানত না সে। মাঝেমধ্যে প্রতিবেশী আন্টিদের বলতে শুনত, এত গম্ভীর কেন আপনার মেয়েটা?

মা কি তাকে ভালবাসত? কি জানি, মনে পরে মা তাকে ঠেসে ধরে খাওয়াচ্ছে। খাব না বললে মাথায় চাটি মারছে, রেগে যাচ্ছে। এর চেয়ে খুশী বুয়া ভাল ছিল। অনেক গল্প জানত। গল্প বলতে বলতে কিভাবে জানি খাওয়া হয়ে যেত। রাতে বাথরুম পেলে ধরে নিয়ে যেত। সকালে স্কুলে যাবার আগে চুলে ঝুটি করে সাদাফিতে বেধে দিত। একদিন কি যে হল, মার কি এক গয়না হারানো গেল, খুশী বুয়াকে মা বের করে দিল।

এরপর যে বুয়া রাখল, সে মার সামনে ভাল ব্যবহার করত। আড়ালে কেবল ধমকাত, ভয় দেখাত। বলত, দুষ্টুমি করলে ভুত আসবে। ভুতের নাম গুইত্যা পোলা। খাটের নিচে থাকে, গা ভর্তি লোম, সুযোগ পেলেই কপ করে বাচ্চাদের আংগুল খেয়ে ফেলে। গুইত্যা পোলার কথা ভেবে এখন এশার হাসি পাচ্ছে। বাবার সাথে কিছু মনে করতে পারে না। সকালে যেত, রাতে আসত। টিভি

দেখত। কিসের নাকি বিজনেস করত, খুব ব্যস্ত। এশার সাথে কথা বলার সময় ছিল না।

এশার অনেক খেলনা ছিল। সেইগুলি দিয়ে একা একা খেলতে খেলতে বিরক্ত হয়ে দিত এক আছাড়। আর খেলনা ভাংগায় বিরক্ত হয়ে মা দিত মার। হি হি হি।

স্কুল? নাহ, সেও ভাল লাগে না। কাড়িকাড়ি পড়া। খটমটে কবিতা মুখস্থ করা। স্কুলেও সে অড নম্বর। সবার বন্ধু আছে, সে একা। ধুর, ধুর। রেজাল্ট খারাপ, আবার আম্মুর মাইর।

এরকম করে বড় হতে হতে কেমন যেন জীবন টাই বিস্বাদ লাগত এশার। টিভি দেখতে অবশ্য ভাল লাগত। ক্রাইম সিরিয়াল, সাইকো কিলারের ক্যারেকটার গুলি বেশ লাগত তার। রাত জেগে দেখত, সকালে স্কুলে ঝিমাত। মা লেখাপড়া, খাওয়া, টিভি দেখা, স্বভাব সব কিছু নিয়ে বিরামহীন অভিযোগ করে যেত, সে এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আরেক কান দিয়ে বের করে দিত।

একদিন স্কুল হঠাত ছুটি দিয়ে দিল। ক্লাস এইটের কোন আপু নাকি মারা গেছে। তা যাক, কত কে মরে। গাড়ি ছাড়াই বাড়ি ফিরছিল এশা। হঠাত পথরোধ করে তিন টা ছেলে, তার চেয়ে বছরকয়েকের বড় হবে। এক টা ফল কাটার ছুড়ি বাগিয়ে ধরে বললো, যা আছে দে, নয়ত ভুড়ি ফাসায়া দিমু। হুমকি শুনে এশার হাসি পেয়ে গেল। পার্স টা ব্যাগ থেকে বের করে দিয়ে ফিকফিক করে হাসতে লাগল। এশা কে হাসতে দেখে ছেলেগুলি একটু ভড়কে গেল। সন্দেহের দৃষ্টি তে তাকিয়ে বললো, তুমি আমাদের কিচ্ছু করতে পারবা না।

- এশা ঠোট উল্টিয়ে বললো, তিনশ টাকার জন্যে কি করা উচিৎ, তোমরাই বল। আমার বয়েই গেছে কিছু করতে।

একটা ছেলে বিড়বিড় করে বললো, মাত্র তিন শ। ধুর বাল, কিচ্ছু হবে না। হঠাত একজন বললো, এই ত গলায় চেইন আছে। এশা সংগে সংগে খুলে দিয়ে দিল। ছেলেগুলি আরো ভড়কে গেল। সম্ভবত নেতা টি বললো বাড়ি যাও, এলাকা টা ভাল না।

এশা হাসতেই লাগল। তার অবচেতন মন জানান দিচ্ছে, এই ছেলেগুলির সাথে সাথে তার কোথায় যেন মিল আছে। এদের শত্রু কম বন্ধু মনে হচ্ছিল বেশি।

ছেলেগুলি বিরক্ত হয়ে বললো, এই চল যাইগা। এই ছেড়ির তাড়ছিড়া। বলে হাটা শুরু করল।

এশা খানিক ক্ষণ তাদের যাওয়া দেখল, তারপর কি ভেবে তাদের পিছু নিল। এই জীবনে প্রথম ইন্টারেস্টিং কোন ঘটনার মুখোমুখি হয়েছে সে। সারাক্ষণ হরর, থ্রিলার দেখে তার ভয়ডর বলে কিছু নেই। আর বেশ বুঝতে পারছিল, ছেলেগুলিই উলটে তাকে ভয় পাচ্ছে।

হঠাত এক টা ছেলে পিছন ফিরে দেখল এশা তাদের পিছু নিয়েছে। সে থামল, এবং সরাসরি এশার দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা গলায় বললো, may I know, why you are following us?

এশা হাসিমুখে বললো, তোমরা টাকা দিয়ে কি করবে? তাই দেখতে যাচ্ছি। ছেলেটা বিরক্ত হয়ে বললো, ড্রাগস কিনব, ইয়াবা, হ্যাপি?

এশা উতফুল্ল ভঙ্গী তে বললো, বাহ, একেবারে ব্রেকিং ব্যাডের মত। ওই লোক টাকে দেখাবে? আমি কখনো ড্রাগ ডিলার দেখি নাই।

শোয়েবের (তিন জনের একজন) মাথা একটু গরম। আর একটু পরেই তার উইথড্রয়াল ইফেক্ট শুরু করবে। খিঁচুনি, মাথাব্যথা। তার এইসব আহ্লাদী সিনেমা ভাল লাগছিল না। সে এশা কে একটা কুৎসিত গালি দিয়ে বললো, দূরে গিয়া মর। ছুরি দিয়া গালে এক পোচ দিলে এইসব ঢং বাইর হয়া যাইব। যা মাতারি।

এশা একটু ভয় পেল, গালে পোচ দিয়ে দেবে? তবু হাল ছাড়ল না। ঢোক গিয়ে বললো, আমার কানে গোল্ডের এয়ারিং আছে, সেটাও দিব। আমার নাম এশা, আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করব না।

শোয়েব বিরক্ত হয়ে রুপক কে বললো, এই টারে কি করবি কর। রুপক শান্ত গলায় বললো, শোন এশা, তোমার যদি মনে হয় তুমি হিন্দি সিনেমার একশন হিরোইনের মত ড্রাগ পেডলার ধরিয়ে দেবার জন্য আমাদের সাথে যেতে চাও, ইউ আর ওয়াস্টিং ইউর টাইম। আমাদের কেউ ধরবে না, ধরলেও ছেড়ে দেবে। এখন বল, যাবে আমাদের সাথে? এশা মাথা নাড়ে, যাবে। বিপদের গন্ধ যে পাচ্ছে না তা না। তবুও বিপদের নেশাই যেন তাকে পেয়ে বসেছে।

রুপক বললো, রুমাল আছে? বের কর। রুমাল পেয়ে এশার চোখ বেধে নিয়ে চল্ল। কাকে যেন ফোন দিয়ে পুরোনো মসজিদের পেছনে আসতে বললো। এইসব জায়গা সাধারণত কেউ সন্দেহ করে না।

এশা অধীর আগ্রহে ড্রাগ পেডলারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। না জানি সে দেখতে কেমন। শুকনা? লাল চোখ? গায়ে ময়লা কাপড়? উৎকট গন্ধ?

হঠাত মনে হল কে যেন আসছে। কেমন মিষ্টি পারফিউমের গন্ধ। তুষার চোখ খুলে দিল এশার। এশা অবাক হয়ে দেখল, ২৫-৩০ বছরের একজন ভদ্র ও মোটামুটি সুদর্শন ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে চশ্মা, কাধে ল্যাপটপ ব্যাগ। লোক টি বিরক্ত গলায় বললো, স্কুলের বাচ্চা ধরে এনেছ কেন? পুলিশের ঝাড়ি খেয়ে সব বলে দেবে। যা প্রফিট সব যদি পুলিশ কেই দিই, আমার থাকে কি?
তুষার বিরক্ত হয়ে বললো, সাইদ ভাই। দুশ্চিন্তার কিছু নেই। এই মেয়ে নিজেই আসছে। আপনার ক্লায়েন্ট বাড়বে।

সাইদ একটু অবাক হয়ে এশাকে বললো, খুকি তুমি ড্রাগস নিতে চাও? এই বয়সে? কেন? তোমার কিসের দুখ?

শোয়েব খ্যাক খ্যাক করে হাসতে শুরু করল, আমাদের কোন দুখ নাই সাইদ ভাই। অনেক সুখ, সুখ বাড়াতেই বাবার গোলামি করি। রুপক গানে টান দেয়, দয়াল বাবা কেবলা কাবা আয়নাল কারিগর।

সাইদ মাথা ঝাকায়, কর যা খুশি। আমি করি পেটের ধান্ধায়, তোমরা কেন কর, তোমরাই জান।

এভাবেই শুরু। দুই টা ট্যাবলেট দিয়েছিল তুষার। বলেও দিয়েছিল কখন খেলে মার হাতে ধরা পরার সম্ভাবনা কম। খেয়ে ভাল ও লেগেছিল। বহুদিনের বিস্বাদ তিতকুটে জীবনে কেমন ফুর্তিবাজ অনুভুতি। নিজেকে কেমন ভালবাসতে ইচ্ছে করছিল। আহ, যতক্ষণ ইফেক্ট ততক্ষণ ই আনন্দ।

শোয়েব দের আবার খুঁজে বের করেছিল এশা। ইয়াবা চাই। শোয়েব বিরক্ত হয়ে বলেছিল, যা যা মহিলা হিরুঞ্চি কোথাকার। এশা নাছোড়বান্দা। রুপক বিরক্ত হয়ে বলত টাকা নিয়ে আস, এইগুলা দান খয়রাতের জিনিস না। বিচিত্র সব

উপায়ে টাকা যোগাড় করত এশা। বার্গার খাবে, ফুচকা খাবে, বান্ধবীর জন্মদিন, কখনো মায়ের পার্স, বাবার মানিব্যাগ থেকে অল্প করে সরিয়ে। এশার তখন ছোট একটা ভাই হয়েছে, মা তাকে নিয়ে খুব ব্যস্ত। খুব একটা খেয়াল করতে পারে নি।

খেয়াল হল যখন স্কুল বা কোচিং থেকে অনুপস্থিতি, বেতন বাকির কম্পলেইন আসতে লাগল। এশার মা প্রথমে ভাবলেন, মেয়ে মনে হয় প্রেম ট্রেম করছে। বাসার মোবাইল বা ফোনে তেমন কিছু দেখা গেল না। শুধু এশার ঝিমুনি বেড়েছে। এই প্রথম সরাসরি মারধোর এ না গিয়ে কিছু বুদ্ধি খাটালেন, বাসার ড্রাইভার কে বললেন এশা কে গাড়ি ছাড়া কিছুদিন ফলো করতে। ড্রাইভার তিন টা ছেলের কথা বললো, আরেকজন লোকের কাছে কি যেন কেনার কথা জানাল। এশার মা এশা কে না জানিয়ে তার উপর নজর রাখতে শুরু করলেন। এক রাতে দেখলেন মেয়ে কি যেন ট্যাব্লেট খেয়ে খোসা টা খুব গোপনীয়তার সাথে স্কুলব্যাগে ভরে রাখল। এশা ঘুমালে স্কুলব্যাগ থেকে খোসা টা সংগ্রহ করলেন। চিনতে পারলেন না।

পাড়ার ডাক্তার কে দেখানোর পর সে বললো এইটা ইয়াবা। এশার মায়ের মাথায় আকাশ ভেংগে পরল। তার মেয়ে নেশা করে? এশার বাবাকে জানাতেই সে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে সব দোষ এশার মায়ের উপর চাপিয়ে দিল। মুর্খ মহিলা, সারাদিন সিরিয়াল দেখে, সন্তানের দিকে কোন খেয়াল নেই, মা নামের কলঙ্ক। এশার মা কেবল বলতে পারল, সন্তান কি মায়ের একার? বাবার কোন দায়িত্ব নেই?

এশাকে পরদিন একজন নামকরা মেডিসিন স্পেশালিষ্ট এর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি অত সময় নিয়ে রোগি দেখেন না, টুকটাক প্রশ্ন করলেন, এশা বিরক্তি নিয়ে দায়সারা কিছু জবাব দিল।

স্পেশালিষ্ট আর সময় নষ্ট করলেন না, বাইরে রোগির লম্বা লাইন। এই বখাটে কিশোরীর সমস্যা সমাধানের খুব আগ্রহ তার ছিল না, রিহ্যাবে পাঠানোর এডভাইস দিয়ে তাদের বিদায় করলেন।

এশা রিহ্যাবে যেতে খুব একটা আপত্তি করে নি। ঘর, মায়ের মমতা, পারিবারিক সান্নিধ্য এসব তার কাছে খুব একটা মানে রাখে না। রিহ্যাব সেন্টারে গিয়ে দেখল তার মত আরো অনেক মেয়ে। সবাই কেমন জম্বি হয়ে আছে। একটা মেয়ের হঠাত খিচুনি শুরু হল, কোত্থেকে এক মেইল ওয়ার্ডবয় এসে তাকে আপত্তিকর ভাবে জাপ্টে ধরে বিছানায় রিস্ট্রেইন দিয়ে বেধে রাখল।

এশার উইথড্রয়াল ইফেক্ট বা এডিকশন এমন কিছু বেশি ছিল না, তবু তাকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হত। মাঝেমধ্যে ঘুমের মধ্যে টের পেত কোন পুরুষালী হাত তার গায়ে নোংরা ঘিনঘিন পোকার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। রেগে উঠতে উঠতে আবার গভীর ঘুমে তলিয়ে যেত। মাঝেমধ্যে হুশে থাকলে সে মেইল নার্স টিকে বলত, সে বাইরের লোকেদের সব বলে দেবে। মাঝবয়সী সেই লোক টি আত্নবিশ্বাসের হাসি হেসে বলত, এইসব নেশাখোর মাগী দের কথা কেউ বিশ্বাস করে না। শুনে অসম্ভব আর অক্ষম রাগে এশার হাত কামড়াতে ইচ্ছে করত। মাঝেমধ্যে ওষুধ খাবে না বলে জিদ করত, মেইল নার্স টি সংগে রুলার দিয়ে বাড়ি দিয়ে দিত। বললো বাড়াবাড়ি করলে শাস্তি আরো বাড়বে।

রিহ্যাবরই আরেকটি মেয়ে একদিন নার্স টিকে লাথি মেরে বসেছিল। মেয়েটিকে তিন রাত উপচে পরা সেপ্টিক ট্যাংকের পাশে বেধে রাখা হয়েছিল। দুর্গন্ধে মেয়েটি বমি করে নিজের জামা ভরিয়ে ফেলে। সেই বমি মাখা অবস্থাতেই সাক্ষাৎ নরকে সে তিন রাত বাধা ছিল।

বাবা- মা তাকে দেখতে এলে সে সব বলার চেষ্টা করেছিল। তারা যে অবিশ্বাস করেছে, তা নয়। তবে রিহ্যাবের অফিসার দের যখন এসব বলা হয়, তখন বলা হয় রিহ্যাব থেকে পালানোর জন্য বেশিরভাগ নেশাখোর রা এধরনের কথা বলে। এদের সব কথা বিশ্বাস করতে নেই।

এশা তবুও পরদিন মাকে অনুরোধ করে, দুইটা দিনের জন্য যাতে তাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। সে কোন ঝামেলা করবে না।

যাহোক, বাড়ি ফিরল এশা। রিহ্যাবের নিয়মিত ঘুমের ওষুধের উপর এশা অনেক খানি নির্ভরশীল হয়ে গেছিল। বাড়িতে এসে তার অভাবে মেজাজ খিটখিটে, ক্ষুধামন্দা, নির্ঘুম রাত কাটাতে লাগল। এশার মা বিরক্ত হয়ে বললেন, তাকে আবার রিহ্যাবে রেখে আসবেন। এশা চুপচাপ শুনে, তারপর জিগেস করে কবে রেখে আসবে? মা জবাব দেয় না।

সে রাতে এশা যে ক্রাইম সাইকো থ্রিলার টা ডাউনলোড দেয়, তার থিম ছিল একটা মেয়ে তার পরিবারের উপর বিরক্ত হয়ে তার বয়ফ্রেন্ড কে নিয়ে মা বাবা কে খুন করে ফেলে। কিভাবে যেন ব্যাপার টা তার মাথায় ঢুকে যায়। ভালবাসা সে মা- বাবার কাছে পায় নি, তাদের প্রতিও তার ভালবাসা নেই। মায়া নেই, বাচতে হবে বা বেচে থাকার প্রতি ও তার এমন কিছু আগ্রহ ছিল না। আবার রিহ্যাবে যাবার বদলে দুনিয়া ছেড়ে গেলেও এমন কিছু হেরফের হবে না।

এশা ভেবেচিন্তে রুপক কে ফোন দেয়। বলে তার কিছু ঘুমের ওষুধ দরকার। রুপক বাকির কারবারে বিশ্বাসী নয় বলে, তার মায়ের একজোড়া সোনার দুল দেবে বলে। রুপক যথাসময়ে বাড়ির সানশেডে জিনিস পৌছে দেয়।

পরদিন সন্ধ্যায় এশা বেশ আগ্রহ করে বাবা মাকে বিকেলের চা বানিয়ে খাওয়ায়। তিতকুটে স্বাদ হলেও বাবা মা তেমন সন্দেহ করে নি। মেয়ে ত আর চা বানিয়ে অভ্যস্ত নয়। খেয়ে একটুপর দুজনেই ঘুমিয়ে গেল। গভীর ঘুম। না, বেশি কিছু করতে হয় নি। বালিশ নাকেমুখে খানিকক্ষণ চেপে ধরে রাখতে হয়েছিল। ঘুমের মাঝে মৃদু ছটফট করে আবার যেন ঘুমিয়ে পরেছিল তারা।

এশার খুব একটা অনুশোচনা হয় নি। এ যেন কোন সিনেমা দৃশ্য। সে সেই ক্রাইম থ্রিলারের কেন্দ্রীয় চরিত্র। নিয়ম মাফিক পুলিশ এল, বাবা মা কে নিয়েও গেল। ছোটভাইটা মা মা করে কাঁদছিল, ছোটখালা তাকে তুলে নিয়ে গেল। এশা চুপচাপ জেলে বসে রইল। আশেপাশে আরো কিছু অপরাধী ছিল। থানাশুদ্ধ লোক তাকে অবাক হয়ে দেখতে লাগল। অত অবাক হবার কি আছে কে জানে। এশার খুব জানতে ইচ্ছে করে, বাংলাদেশে সেই প্রথম পিতৃমাতৃ হন্তাকারী কি না। তাকে নিয়ে নাকি বেশ তোলপাড় হয়েছিল, তার পরে যেসব মেয়ে জেলে এসেছিল তাদের কাছে শুনেছিল। জেল তার খারাপ লাগত না। আশেপাশের মানুষ গুলির সাথে তার কোথায় যেন মিল ছিল। তার মতই নিষ্ঠুর, আবেগহীন, অহেতুক মায়া নেই। মাঝেমধ্যে দুয়েক টা সাধারণ মানুষ এসে হাজির হত, এসে খুনখুনে গলায় কাঁদত, জেলে এসেছে বলে নিজের ভাগ্য কে দোষারোপ করত। এদের কে এশা এড়িয়ে যেত।

‘আর ৪৫ মিনিট’. হঠাত বর্তমানে ফিরে এল এশা। জেলার সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, তার প্রিয় কোন খাবার সে খেতে চায় কি না, একটু পর মাওলানা তাকে তওবা পরাতে আসবে। সে চাইলে গোসল করে নামাজ পরতে পারে। এশার কেমন হাসি পেয়ে যাচ্ছে। মরার পর ক্ষুধা পাবে নাকি, যে এখন খেয়ে নেবে? হাসিমুখে বললো আংকেল ইয়াবা হবে? দুইটা হলেই হবে।

জেলার সাহেব বিড়বিড় করে কি যেন বলে চলে যান। বিকেলে তার খালা খালু এসেছিল। অস্বস্তিকর ব্যাপার। একবার ভাবল, জিগেস করে বাবলুর কথা, তার ছোট ভাই। আর জিগেস করল না, কি লাভ । ওই রাতে, কাজ শেষ করার পর বাবলু হঠাত মা মা বলে মায়ের মৃতদেহ টা ধরে কাঁদছিল, খিদে পেয়েছিল মনে হয়। একটু খারাপ লেগেছিল তখন। মা তার দরকার না হলেও বাবলুর দরকার ছিল। পুলিশ এসে যখন বললো, সময় শেষ, খালা খালু এবং সে দুজনেই হাফ ছেড়ে বাচল। তারা চলে গেলেন।

এশা কি গোসল করবে? ইচ্ছে করছে না। তার মত মেয়ের জন্য নিশ্চয় ই বেহেশত অপেক্ষা করে নেই। দোজখে যেতে অত হাংগামা করে কাজ নেই। একটু সাজগোজ করতে ইচ্ছে করছে। শোয়েব বলেছিল, সে নাকি বলিঊড এক্ট্রেস নন্দিতা দাসের মত দেখতে। জেলার সাহেবের কাছে সাজগোজের জিনিস পত্র চাইছে - ব্যাপার টা ভেবেই কেমন হাসি পাচ্ছে।

মাওলানা সাহেব এসেছেন তওবা করাতে। নরম গলায় বললেন, অযু কর মা, তোমাকে আল্লাহর কাছে যেতে হবে। অনেক দিন কেউ এমন আন্তরিক স্বরে তার সাথে কথা বলে নি। এশা শান্ত ভঙ্গী তে অযু করে নিল। মাওলানা সাহেবের সাথে গতবাধা কথা আওড়ে গেল। মাওলানা সাহেব বললেন, কারো ওপর রাগ

রেখ না মা, সবাই কে ক্ষমা করে দাও। এশা ঠিক মনে করতে পারল না কারো ওপর রাগ আছে কি না। শেষে রিহ্যাবের লোক জন ছাড়া বাকি সবাইকে ক্ষমা করে দিল।

দুজন মহিলা পুলিশ এসে দাঁড়াল। সময় হয়ে গিয়েছে বোধ হয়। একবার কি জিগেস করবে আর কয় মিনিট আছে। থাক, দরকার নেই। পুলিশ দের সাথে চলতে গিয়ে তার কেমন একটু শীত শীত করতে লাগল। সেপ্টেম্বরে ত ঠান্ডা থাকার কথা না। ভয় লাগছে বোধ হয়। কি আশ্চর্য, তার মায়ের কাছে যেতে ইচ্ছে করছে, যে মাকে - - - এশা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। কি ভয়ংকর একা সে।

ফাসির মঞ্চের কাছে আবার কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা। কি অস্বস্তিকর সময়। বেঁচে থাকার আদিমতম প্রবৃত্তি থেকেই কি না কে জানে, তার খুব পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে এখান থেকে। সুন্দর কিছু ভাবতে পারলে ভাল হত।
ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ফাসির আদেশ পড়তে শুরু করেছেন। ফাসির দড়ি তৈরি করছে দুজন লোক। এদের নাকি জল্লাদ বলে। ভাল লাগছে না এসব দেখতে, কেমন যেন কান্না পাচ্ছে। এসব ভুলতে সে নাক চেপে স্নিফ করল, যেন ইয়াবার ধোয়া নিচ্ছে। সত্যিই কেমন নেশার ঘোরে চলে গেল সে।

ষোলই ডিসেম্বরের স্কুলের স্টুডেন্ট প্যারেড দেখতে পায় এশা। পিঁপড়ের সাড়ির মত ঝাকে ঝাকে ছেলেমেয়ে রা চলছে, ছকে বাধা, তাল মেলানো, মাঝেমধ্যে দুয়েক জন ছন্দ ভুল করে ফেলে এশার মত। তাদের সরিয়ে ফেলা হয়, অথবা তারা নিজেই সরে যায়।

ফাসির মঞ্চের দিকে হাটিয়ে নেয়া হচ্ছে তাকে। আর কয়েক মুহুর্ত পর ই এই বিরল পাপী মেয়েটির মৃত্যু তে দেশ ভার মুক্ত হবে। পৃথিবী যদিও অত নিষ্ঠুর নয়, পরম মমতায় মাটির কোলে আশ্রয় দেবে এশা কে। সে কাউকেই ফেরায় না।

ঠাটবাট

আজ রুবি ভাবির বাসায় পার্টি। উনাদের বাসায় প্রায় পার্টি থাকে, দিদার ভাইর বাড়ি বিক্রমপুর। আতিথেয়তা তার শখ এবং জীবনের অনুসংগ। প্রায়ই পার্টি দেয় তাই। অনেক মানুষ এসেছে। অনেকেই কেউ কাউকে চেনে না।

মুনা দেশ থেকে এসেছে কয়েক মাস হয়। বলা চলে হানিমুন পিরিয়ড চলছে। নতুন সংসার, হাড়িকুড়ি, ইউটিউব রেসিপি এপ্লাই, আশেপাশে ঘুরাঘুরি চলছে।। সম্প্রতি সে ফেসবুক একাউন্ট ও খুলেছে, প্রতিদিন ই ছবি দেয়, রান্নার, নতুন ফ্রাইংপ্যান, শপিং ট্রলির- বিষয়বস্তুর অভাব নেই। আত্নীয় বন্ধু সবাই লাইক দেয়, বড় সুখে আছে সে।

তবে কিছুটা নি:সংগ, সে গ্রামে এক ঘর ভরা মানুষের মাঝে থেকে অভ্যস্ত। এখন গল্প করার মত লোক নেই। ফোনে আর কাহাতক গল্প করা যায়? রক্তমাংসের কারু সাথে গল্প করতে মন চায়। তার স্বামী হাসান সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করে। কাজের রুটিনের রাত দিন নাই। বাসায় থাকলে সে স্পোর্টস, টক শো নিয়ে ব্যস্ত থাকে, এটা সেটা রান্নাবাড়া করতে বলে, এত বছরের একা

ব্যাচেলর জীবন শেষে একটু আরাম করতে চায়। হাসানের বয়স ৩৩, মুনার ২০। দুইজনের কথা বলার মত এমন কিছু নেই যা দুজনেই উপভোগ করবে। মুনার এ নিয়ে দুখ নেই। তার বান্ধবী দের একজন প্রেম করে বিয়ে করেছে, চ্যাংড়া জামাই, টাকাপয়সা নেই। সেই মেয়ে তিন টা থ্রিপিস ই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরে। সাজগোজের জিনিস নাই, মুনা আসার আগে তার কিছু জিনিস বান্ধবী কে দিয়ে এসেছে। তবুও মুনার গল্পগাছার জন্য মেয়ে বন্ধু চাই, হাসবেন্ডের সাথে মেয়েলী আলাপ চলে?

তাই সে অন্যের সাথে মিশতে চায়। তবে তার স্বামী হাসান, সতর্ক করে দিয়েছে যার তার সাথে মিশতে না। কিছু বাংগালি ভাবির চলা চলতি ভাল না, শেষে মুনা বিগড়ে যেতে পারে। না না , মুনা একেবারেই বিগড়াতে চায় না। সে সংসারের শান্তি বজায় রাখায় বিশ্বাসী।

পার্টিতে সে সবাইকে তার অনভিজ্ঞ চোখে পরিমাপ করে, কার সাথে কথা বলা যায়? পার্টিতে যারা পুর্ব পরিচিত তারা নিজেদের মধ্যে গল্প করছে, যাদের বাচ্চা ছোট তারা বাচ্চা নিয়ে ব্যস্ত। তাদের খাওয়াতে হচ্ছে, পাহারা না দিলে হয় জিনিস পত্র নষ্ট করছে অথবা বাইরে চলে যাচ্ছে। রুবি ভাবি আয়োজন তদারকি নিয়ে খুব ব্যস্ত। সে কারুর সাথে ভিড়তে পারছে না। আগ বাড়িয়ে কার সাথে কথা বলবে?

- আপনি অন ট্রে আইটেম নিয়েছেন? - একজন স্মার্ট , পরিপাটি ভাবি জিগেস করেন।

- জি? কি নিব বললেন?

- ওই যে, স্প্রিং রোল, চিপ্স নিয়েছেন?

- জি নিয়েছি।

- আমি তানিয়া, আপনি?

- মুনা, আমার হাজবেন্ডের নাম হাসান।

তানিয়া হেসে ফেলে, মেয়েটা মনে হয় এদেশে নতুন। এখনো আইডেন্টিটি নিয়ে কনফিডেন্ট হতে পারে নি। তানিয়াও এমন ছিল । আপনি একা বসে আছেন, তাই আলাপ করতে এলাম।

- জি, খুব ভাল হল। আমি এখানে কাউকে চিনি না তেমন।

- ক বছর হল এখানে এলেন?

- তিন মাস আগে এসেছি।। আপনি?

- এই বছর তিনেক।

- তা ত অনেক দিন। মুনা অবাক হয়।

- হু, আপনার তুলনায় ত অনেক ই। হাসে তানিয়া।

- ছেলেমেয়ে নেই?

- প্ল্যান করি নি এখনো। দেখি আরেক টু গুছিয়ে নিই।

মুনা খুব অবাক হয়। তিন বছরেও বাচ্চা চায় না? বলে গুছিয়ে নি, নাকি বাচ্চা হয় না? সমস্যা আছে?

- ও আচ্ছা, জব করেন?

- হ্যা।

- কি সে?

- একটা ইউনিতে। ক্লিনিং করি।

- ক্লিনিং? কি ক্লিন করেন? মুনা আরো অবাক।

- ফ্লোর, টয়লেট সবই করা লাগে।

মুনার একটু গা ঘিনঘিন করে। এই মহিলা সুইপার? মেথর? ছিঃ। এর পাশে বসতেও অস্বস্তি লাগছে। তার একটু শুচিবাই আছে হোক বিদেশি সুইপার। সুইপার ত সুইপার ই। অথচ পোশাক আশাক, গয়নাগাটি বেশ দামী, কে বুঝবে বাইরে থেকে। এতক্ষণ যে আন্তরিক গলায় কথা বলছিল, তাতে ভাটা পরে।

মুনার চেহারার পরিবর্তন টা তানিয়ার চোখ এড়ায় না। সে মনে মনে একটা ছোট্ট শ্বাস ফেলে। তানিয়ার হাজবেন্ড এখনো স্টুডেন্ট, তাদের রেসিডেন্সি নেই। এ অবস্থায় জব নিয়ে খুতখুত করার অবস্থায় সে নেই। তার টাকা দরকার। তারা তিন বোন, ভাই নেই। একজনের বিয়ে হয়ে গেছে, আরেকজন এখনো পড়ছে। মা বাবা গ্রামে থাকে, বাবা রিটায়ার্ড স্কুল মাস্টার। সে এখান থেকে সাহায্য না করলে তারা চলতে পারবে না। তার হাসবেন্ড আতিকের ওয়ার্কিং আওয়ার পারমিট সপ্তাহে মাত্র ২০ ঘন্টা, ম্যাক্সিমাম ইনকাম তানিয়াই করে। খেতে পরতে চলতে খরচ প্রচুর। শৌখিন গৃহবধূ হবার মত অবস্থা তার নেই। আর এ অবস্থায় বাচ্চা নেবার মত বিবেচনাহীন কাজ ও সম্ভব না। বাইরের লোকে এসব কিছুই বুঝে না।

- ভাইয়া কি করে, ভাবি?

- ও স্টুডেন্ট। পার্টটাইম কাজ করে এইজেড কেয়ারে।

- এইজেড কেয়ার কি?

- ওল্ড হোম। সংক্ষেপএ বলে তানিয়া।

- সেখানে কি করতে হয়?

- সব, গোছল, খাওয়ানো, বাথরুম করানো, সব। তানিয়া রাখঢাক করার চেষ্টা করে না। সে তার পেশা বা স্বামীর অবস্থা নিয়ে লজ্জিত না, কেন রাখঢাক করবে?

মুনা আরো গম্ভীর হয়ে যায়। হাজবেন্ড ওয়াইফ দুইজনেই খবিশ। দেশে আর কাজ নাই? একজন সুইপার আরেকজন আয়াবুয়ার কাজ করে, ছিঃ।

এমন সময় রুবিভাবি ডিনার খেতে ডাকে। মুনা হাফ ছাড়ে। তাড়াতাড়ি ডিনার নিতে চলে যায়, এই সুইপার মহিলার ছোঁয়াছুঁয়ি এড়াতে চায় সে।

তানিয়া মুচকি হাসে। তার কাজের প্রথম দিনের কথা মনে পরে, ক্লিনিং মব হাতে নিয়ে এমন কান্না পেয়েছিল। আজ ও মন টা খারাপ হচ্ছে। জানে সে বেকার থাকার চে শ্রমের গুরুত্ব অনেক বেশি। তবু কারু অসম্মানের দৃষ্টি বড় কষ্ট দেয়।

- কি, নতুন গাড়ি কিনছেন বলে?

রুবির ডাকে বাস্তবে ফিরে তানিয়া। - জি ভাবি, এই আর কি?

- ব্রান্ড নিউ?

- না, ২০১৬ এর। ভোক্স ওয়াগন।

- প্রায় নতুন ই ত । আমি ত লাইসেন্স ই নিতে পারলাম না। গাড়ি ত স্বপ্নই।

- নিয়ে নেন, অনেক ভাল ইন্সট্রাকটর আছে এখন।

- তোমার ভাই ব্যাটা ইন্সট্রাকটর পছন্দ করে না।

- মহিলাও আছে। রকডেলের আঞ্জুমান ভাবি, বেশ ভাল শেখায় শুনেছি।

- আচ্ছা, নম্বর টা দিয়েন। এখন ডিনার করেন,আসেন। ডেজার্টে আজকে তিন পদের মিষ্টি করেছি। খাইয়েন মনে করে, আপ্নে ত আবার ডায়েটকন্ট্রোল করেন।

- আরে না, দাওয়াতে আবার কিসের ডায়েট?

খাওয়া গল্প পার্টি শেষে যে যার বাড়ি চলে যায়।

৫ বছর পর

তানিয়া এখন একটা অফিসের পার্টটাইম রিসেপশনিস্ট। ব্যাংকিং কোর্সে এডমিশন নিয়েছে। বাচ্চার বয়স ২। সিটিজেনশিপ হয়ে গেছে। ওলাইক্রিকে একটা এপার্টমেন্ট কিনেছে তারা। আতিক এখন নভোটেল হোটেলে এসিস্ট্যান্ট হেড শেফ। সব গুছিয়ে নিয়েছে তারা। সামনের বছর নিউজিল্যান্ড বেড়াতে যাবে। এমনিতে বছরে ৩-৪ বার এদিকওদিক ঘোরাঘুরি হয়। ভাল আছে তারা। তানিয়ার ছোটবোন ও এখানে এখন। দুই বোনের ইনকামে গ্রামে একটা ভাল বাড়ি আর বাজারে দুইটা দোকান আছে। তার বাবা মা ভালই আছে।

মুনার বাচ্চা দুইটি। সংসারের খরচ ও বেড়েছে অনেক। হাসানের বয়স ৪০। কাজকর্ম সেরকম করতে পারে না। মুনা কাজ করতে চায়, কিন্তু প্রায় অসম্ভব মনে হয়। ঘরের সমস্ত কাজ সামলে আর বাইরে কিভাবে কাজ করবে? কি কাজ ই বা করবে? ভাল ইংরেজি ও জানে না। তাছাড়া এখন নাকি কোর্স ছাড়া কাজ ও পাওয়া যায় না? ভরসা যে সেন্টারলিংক থেকে ২ বাচ্চাবাবদ মাসে হাজার ডলার। সেটা সংসারেই লেগে যায়। গতবছর তার বাবা মারা গেছে। স্ট্রোক করে আই সিউ তে ছিল ১৫ দিন। অত খরচ বাসায় আর যোগানো যায় নি, হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে এনেছিল সবাই। এর দুইমাস পর বাসাতেই মারা যায় , তার খুব ইচ্ছে ছিল বাবার জন্য কিছু চিকিৎসা খরচ দেয়, কিন্তু হাসানের হাত একেবারেই

খালি ছিল। অনেক কেঁদেছিল সে, দেশে যেতে চেয়েছিল বাবা কে দেখতে। টিকেটের দাম যোগাতে পারে নি।

মাঝেমধ্যেই তানিয়ার কথা মনে হয় তার। সুইপার হোক আর যাই হোক, তার নিজের ইনকাম ছিল। সে হয়ত প্রয়োজনে নিজের পরিবার কে সাহায্য করতে পারে, দেশে যাবার টিকেটের জন্য স্বামীর মুখাপেক্ষী হতে হয় না। বাচ্চাকাচ্চা বড় হলে, সে ঠিক একটা জব করবে। এটা তার একটা স্বপ্ন।

যদিও সেটা আসলে বাস্তব হয় না। অভ্যাস, অভ্যস্ততা এসব ছেড়ে বেড় হওয়া টা শুনতে যত সহজ, করতে ততটাই কঠিন। জীবন একটা ওয়ান ওয়ে জার্নি, পালটাতে স্রোতের বিপরীতে সাতরাতে হয়।

কম্প্রোমাইজ

লিভারপুল হসপিটালের ইমার্জেন্সিতে বসে আছে রুনি। সংগে তিন বছরের ছেলে ফরহাদ। ফরহাদ অবশ্য বসে থাকতে চাইছে না। সারা রুম ছোটাছুটি করছে। আশেপাশে আরো অসুস্থ রোগি, তারা বিরক্তি নিয়ে তাকাচ্ছে। এক মাতাল চেঁচিয়ে উঠেছে, ওয়াচ ইউর ফা*** কিড। পুলিশ তাকে বসিয়ে দিয়েছে।

ফরহাদ আবার দরজার দিকে দৌড় দিল। অটো সেন্সর ডোর, কাছে গেলে খুলে যায়। বাইরেই রাস্তা। রুনি উঠে দৌড়ে ফরহাদ কে ধরে আনে। ফরহাদ আরো জোরে চিৎকার শুরু করে। রুনির ইচ্ছে হল, ফরহাদ কে শক্ত করে একটা আছাড় দিতে, তারপর যদি সে থামে, বিদেশ বলে পাবলিক প্লেসে বাচ্চাদের মার দেয়া যায় না। ফরহাদ কে ওয়াশরুমে নিয়ে গেল সে, সেখানে গিয়ে এক চিমটি দিয়ে ভয়ংকর চেহারাযুক্ত করে বললো, চুপ, আর একটা সাউন্ড করলে জান শেষ করে ফেলব। ফরহাদ তারপর ও চেঁচানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে, এখন রাত বারটা,

বাইরে তুষারপাত হচ্ছে এসময় তার ডিনার শেষে নরমগরম বিছানায় শুয়ে থাকার কথা। রুটিন পালটে যাওয়ায় তার মেজাজমর্জিও পালটে গেছে।

রুনির ধৈর্য চ্যুতি ঘটল। হিংস্রভংগিতে ফরহাদের চুল মুঠি করে ধরল, বলল, চুপ চুপ। ফরহাদ এবার ভয় পেয়ে আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করে। রুনি ক্লান্ত ভঙ্গী তে ফরহাদ কোলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে, ইটস ওকে বাবা, ইটস ওকে। উই উইল গো হোম। ফরহাদ রুনির গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। মা, আই এম হাংরি। গেট মি সামথিং টু ইট। ক্যান আই হ্যাভ এ স্নিকার?

ভেন্ডিং মেশিনে একটা স্নিকারের দাম সাড়ে তিন ডলার। রুনির জন্য এটাই দুর্মুল্য। সে ঘন্টায় ১০ ডলার কাজ করে। বাচ্চা নিয়ে বেশিক্ষণ পারেও না। সপ্তাহে সর্বসাকুল্য ১২-১৫ ঘন্টা। এই টাকায় হুটহাট স্নিকার কিনে ফেলা যায় না। দিনে হ্যাপি আওয়ারে ৫ ডলারে একজনের পেট ভরার মত খাওয়া জুটে যায়। একবছর আগে, এমন পরিস্থিতির কথা গল্প উপন্যাসে পড়লেও হয়ত কেঁদে ফেলত। এখন আর সে কাঁদে না, শক্তমুখে বলে আমরা বাড়ি গিয়ে খাব। ফরহাদ আবার চেঁচাবার উপক্রম করে, রুনি এবার স্নিকার কিনে ফেলে, আরো ১ ঘণ্টা কাজ করে নেবে এই সপ্তাহ । ফরহাদ আপাতত শান্ত হয়।

রিসেপশনের দিকে এগুল রুনি। রিসেপশনিস্ট ব্যস্ত, ব্যাজে নাম লেখা নিকোল। ক্রিস্মাস সিজন, রেগুলার দেশবাসীর সাথে আরো হাজারখানেক টুরিস্ট যোগাড় হয়েছে। কতজন এসে হাবার মত বলছে, নো ইংলিশ, স্প্যানিশ ইন্টারপ্রেটার, প্লিজ।

রুনির দিকে বিরক্তি চেপে তাকাল নিকোল। এই ধরনের শেল্টারে থাকা মহিলা রোগি গুলি ঝামেলা আরো বাড়ায়। সত্যিকারের কোন শারীরিক সমস্যা না

থাকলেও নানারকম উপসর্গ নিয়ে এম্বুলেন্স চড়ে ইমারজেন্সি তে হাজির হবে। গাদাখানেক টেস্ট করার পর দেখা যাবে সব মানসিক। অতঃপর সাইকিয়াট্রিস্টের রেফারেল দিয়ে বাড়ি পাঠাও। ঘাড়ে ধরে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে ইচ্ছা করছে।

- এক্সকিউজ মি, প্লিজ। হাউ লং ইট উইল টেক টু সি দ্য ডক্টর?

- নট কোয়াইট সার্টেন, ম্যাম। মে বি আওয়ার অর টু, কুড বি থ্রি ইভেন।

- লুক ,আই হ্যাভ এ কিড উইথ মি। হি ইজ হাংরি এন্ড স্লিপি, আই ক্যান নট সেটল হিম ।হি ইজ ডিস্টার্বিং আদার পেশেন্ট।

নিকোল একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে, তোমাকে ত কেউ দাওয়াত করে আনে নি সোনা। মুখে এক ধরনের কাঠিন্য মিশ্রিত মাপা পেশাদার হাসি মিশিয়ে বলে, আই ক্যান আন্ডার স্ট্যান্ড ইউর সিচুয়েশন ,ম্যাম ।বাট ইউ শুড নো, দিস ইজ ইমারজেন্সি ।দেয়ার আর লট অফ আদার সিরিয়াস পেশেন্ট। নোবডি ইজ সিটিং আইডল হিয়ার ।ইউ নিড টু হ্যাভ পেশেন্স।

ফরহাদ এবার টেবিলে রাখা ম্যাগাজিনের পাতা ছিড়তে শুরু করেছে। রুনি নিকোলের দিকে তাকিয়ে বললো, মে আই গো হোম নাউ? দেন সি দ্য ্ডক্ট্রর সামটাইম লেটার অন।

- আপ টু ইউ। বাট ইউ নিড টু সাইন অন পেপার, বিফোর ইউ লিভ, দ্যাট ইউ আর লিভিং উইথ ইউর অন। ডক্টরস অর হস্পিটাল উইল নট হ্যাভ এনি রেস্পন্সিবিলিটি ইফ এনিথিং হ্যাপেন টু ইউ।

- ওকে ,গিভ মি দ্য পেপার, প্লিজ।

সাইন করে ভাবতে বসল বাড়ি ফিরবে কি করে । ট্যাক্সি ছাড়া উপায় নেই। হন্তদন্ত হয়ে আরেক টা পরিবার ঢুকল। সাউথ ইন্ডিয়ান মনে হয়। লোক টা তার

ওয়াইফ কে কিচিরমিচির করে কি যেন বললো, সম্ভবত গাড়ি পার্ক করে আসতে যাচ্ছে। মহিলা মাথা নাড়ল।

ট্যাক্সি কল করে অপেক্ষা করতে লাগল রুনি। ফরহাদ ঘুমিয়ে পরেছে। রুনি আর তার ছেলে দুজনেই ছোটখাট, তবু তাকে কোলে নিয়ে হাটতে হাফ ধরে যাচ্ছে রুনির । বিদেশ এলে বাংলাদেশি মেয়েরা ডায়েট করে কুল পায় না মোটা হচ্ছে বলে। সে জায়গায় কৃচ্ছসাধন করতে গিয়ে সে আর তার ছেলে বেশ স্লিম।

ট্যাক্সি আসার সাথে সাথে সেই সাউথ ইন্ডিয়ান লোক ও চলে এসেছে। এসেই বউ ছেলেমেয়ের কাছে ছুটে গেছে। বাচ্চা পাপা পাপা বলে তার কোলে ঝাপিয়ে পরল। ট্যাক্সিতে বসে শেল্টারহোমের ঠিকানা বললো রুনি। উদ্বিগ্ন চোখে মিটারের দিকে তাকিয়ে আছে সে। আড়াই ডলার - তিন- সাড়ে তিন ; গন্তব্যে পৌছুতে পৌছুতে সাড়ে ১২ ডলার।

পনের ডলার দেবার পর ,ট্যাক্সিওয়ালা ২ ডলার ফেরত দিল। ৫০ সেন্ট সে নিজের টিপস মনে করে রেখে দিচ্ছে। রুনি কঠিন গলায় বললো, আই ও ইউ ৫০ সেন্ট। টাক্সিওয়ালা গোমড়ামুখে ৫০ সেন্ট ফেরত দিয়ে টায়ারে শব্দ করে চলে গেল।

ঘুমন্ত ফরহাদ ,হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে সিড়ি ভাংতে শুরু করল সে ।তিন তলায় তার ঘর। এ সময় টায় তার মাঝে মধ্যে তাহেরের কথা মনে পরে। তাহের ফরহাদ কে কোলে নিত সিঁড়ি ভাংবার সময় । দোতলায় উঠে বড় করে শ্বাস নিল, রুনি। আর এক তলা, তারপর।

ঘরে ফিরে আস্তে ফরহাদ কে শুইয়ে দিল। ছেলেটা ঘুমের মাঝে ছটফট করছে। খিদে লেগেছে মনে হয়। আস্তে উঠে দুধ বানাল রুনি। ফিডার ফরহাদের

মুখে দিয়ে কাপড় ছেড়ে ছেলের পাশে শুয়ে পরল সে। সারাদিনের ধকলে প্রচন্ড ক্লান্ত সে, তবু ঘুম আসছে না। এক সময় সে বেশ শুয়েই ঘুমিয়ে পরতে পারত। এক ঘুমে রাত কাবার, সে সময় টা সে একজন অতি সৌভাগ্যবতী মানুষ ছিল, এ কথা তখন বুঝতে পারে নি। তার আপাত স্থায়ী অবস্থা যথেষ্ট করুণ , এর উপর ও প্রতিদিন নিত্যনতুন ঝামেলা লেগেই থাকে। যেন ঝামেলার কিছু খামতি হচ্ছিল তার, তার উপরি কিছু ঝামেলা চাই। আজ গেল, পুলিশ ,এম্বুলেন্স, হাসপাতাল ।

গত সপ্তাহে যে ক্যাশের হাউজকিপিং ,কুকিং জব টা করত ,সেটা ছেড়ে এসেছে। কেননা, সে ওভেনে একটা মুরগি গ্রিল করতে দিয়ে তার এমপ্লয়ার বা বাংলাভাষায় বাড়িওয়ালা কে এক ঘন্টা পর নামাতে বলে চলে এসছিল। পরে তারা ফোন করে শাসিয়েছে, রাত আট টায় ফায়ার এলার্ম বাজার পর তাদের খেয়াল হয়েছে গ্রিলের ভেতর দুপুর বেলায় মুরগি দেয়া হয়েছিল।

আজ সকালে তার হাউজমেট এক ড্রাগ এডিক্ট সাইকো মহিলা ফরহাদের প্রাম তিন তলা থেকে ফেলে দিয়ে ভেংগে ফেলেছে। রুনি নাকি তার প্রাম ঠিকমতো না রাখায় তার প্রাম এর সাথে ধাক্কা খেয়ে ভেংগে গেছে, এখন রুনির ২০০ ডলার দিতে হবে তার ভর্তুকি বাবদ। ১০ টাকা ইনকাম করতে যেখানে হাড় কালো হয়ে যায়, সেখানে ২০০ ডলার মুফতে উড়িয়ে দেবার মত অবস্থা রুনির নেই। সে আবহমান বাংলার মেনে নাও, মানিয়ে নাও সংস্কৃতির মানুষ। আড়েদীঘে দেড়গুণ বিদেশি ড্রাগ এডিক্ট মহিলার সাথে ঝগড়ায় জিতে যাবার তরিকা তার জানা নেই। জীবনে এ ধরনের পরিস্থিতি দেখতে হবে এ তার কল্পনায় ছিল না কোন দিন। ওই মহিলা মারমুখী হয়ে তাকে মারতে আসলে সে

ভয়ে দরজা আটকে পুলিশে কল দিয়েছে। ভাগ্য ভাল পুলিশ এসেছে, কিন্তু তার শুরু হয়ে গেছে প্যানিক এটাক।

প্যানিক এটাক শুনতে যত সাধারণ, আসলে ততখানিই ভয়ংকর। অন্ততপক্ষে, রুনির জন্যে। তার মনে হতে থাকে , সে মারা যাচ্ছে। তার হাত পা, ভয়াবহ ভাবে কাঁপতে শুরু করে, হৃৎপিন্ড মনে হয় লাফিয়ে বের হয়ে যাবে এরপর পেটের নাড়িভুঁড়ি সব গুলিয়ে উঠে। তারপর শুরু হয় খিচুনি, হাত পায়ের আংগুল বাকা হয়ে শক্ত হয়ে যেতে থাকে। পুরো দৃশ্যটা এতখানি আতংকজনক, ফরহাদ ভয়ে চিৎকার শুরু করে। বিষয়টার উৎপত্তি মানসিক হলেও একে নিয়ন্ত্রণের কোন উপায় রুনির জানা নেই। একটাই উপায়, আধাঘণ্টা অপেক্ষা করলে আস্তে আস্তে খিচুনি কমে আসে।

আজ যে পুলিশ এসেছিল, সে এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে এম্বুলেন্স কল করেছে। সে যেতে রাজি হচ্ছিল না, এদেশের হাসপাতাল ইমার্জেন্সি বিভাগ অভিজ্ঞতা তেমন সুখকর কিছু না। প্যারামেডিক বললো, তোমার হার্টবিট ১৩০ এর উপরে, ডাক্তার দিয়ে চেক করিয়ে নাও, যে আসলেই কোন সমস্যা হয় নি। আমরা এম্বুলেন্স এ তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। রুনি ভেবেছিল, এম্বুলেন্স এ আসা রোগি হয়ত প্রায়োরিটি পাবে, কিন্তু তারা ইসিজি করে শেল্টারের পেশেন্ট শুনেই তাকে লাস্ট প্রায়োরিটি হিসেবে রেখেছে।

এত ঝামেলার পর, পুলিশ কাল ওই মহিলাকে অন্য শেল্টারে সরিয়ে নেবে বলেছে, রুনি এতেই শুকরিয়া আদায় করেছে।

অধিকাংশ রাতের মত আজ ও রুনি নির্ঘুম। জোর করে ঘুমাতে চেয়েও পারছে না , কাল সারাটা দিন মাথা ঝিমঝিম করবে, গা গুলাবে। না চাইতেও,

সেই একই ভাবনা আবার তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। তাহেরের ঘর ছেড়ে এসে কি সে কোন ভুল করেছে? তার কি আরো ধৈর্য ধরে মাটি কামড়ে পরে থাকা উচিৎ ছিল?

তাহেরের কর্মকান্ডের ব্যাখ্যা সে কোনদিন ই বুঝতে পারে নি। লোক টা পাগল না বদমাশ, কে জানে? রুনির বেশ নির্ঝঞ্ঝাট একটা জীবন ছিল। সে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার, গ্রাজুয়েশন এর পর সে একটা ডিজাইন এবং মার্চেন্ডাইজ কোম্পানি তে ৪০ হাজার টাকা বেতনের এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে জব করত। তখন ই তার এক বান্ধবীর মাধ্যমে তাহেরের সাথে পরিচয় হয়। দুজনে প্রাপ্তবয়স্ক, শিক্ষিত, উন্নত রুচির - তাহের ই বিয়ের প্রস্তাব দেয়। শুভক্ষণে বিয়ে হয়ে সে বিদেশযাত্রা করে।

বিদেশে এসে তাহেরের অবস্থা দেখে সে অবাক। বাসাভর্তি পর্নোগ্রাফিক সিডি, ম্যাগাজিন। এমন কি নানাবিধ এডাল্ট শপ আইটেম। এই বাসায় যে অন্যান্য মহিলার আনাগোনা চলে তা বুঝতে দেরি হয় নি রুনির। সবচেয়ে অবাক হয়, তাহের এসব লুকানোর চেষ্টা কেন করে নি।

পৃথিবীর আর সব বিবাহিত মেয়েদের মত রুনিও একই ভুলের পথে পা বাড়ায়, দেখি স্বামীর মতি পরিবর্তন হয় কি না। রুনি অবশ্য স্বাবলম্বী হবার চেষ্টায় জব নিয়েছিল। টুকটাক ঝগড়াঝাঁটি হয়, সে ভেবেছে এমন সবার হয়। তার বাস্তবজ্ঞানে কাউকে দেখে নি, স্বামী মেরেধরে তাড়াবার আগে বউ সরে আসার চিন্তা করছে।

এক সময় সে প্রেগন্যান্ট হয়। ভালই, মেয়েদের সার্থকতাই মা হওয়াতে (সবাই তাই বলে) কিন্তু এবার তাহের একেবারে পেয়ে বসেছে। হাসপাতাল,

ডাক্তার, ঘরবাড়ি, চাকরি সব রুনির একার দায়িত্ব। একদিন রেগে চেঁচামেচি করাতেই গলা চেপে ধরল রুনির, একদম চুপ। আমার ঘর করতে হলে আমার কথায় চলতে হবে।

রুনি আর তাহের পাল্টাতে থাকে, সেই শিক্ষিত, নম্র ভদ্র রুনি আজকাল কেমন বদমেজাজি হয়ে গেছে। ইদানীং তাহের হাত তুলতে আসলে সেও হাতাহাতি শুরু করে, চিৎকার করে গালিগালাজ করে। আরেকদিন তাহেরের ঘুষিতে বুকের কাছটায় কালশিটে পরে যায় রুনির। ডাক্তার দেখে নিজেই রিপোর্ট করে পুলিশে। পুলিশ আসার পর তাহের কিছু মোবাইল ভিডিও ক্লিপ দেখায়। রুনির চেঁচামেচির, রুনির হাতাহাতির। রুনিই নাকি তাকে মেরে ফেলতে পারে। তার ডায়াবেটিস, রুনি তাকে ইন্সুলিন দিয়ে মারবে। একবার অসুস্থ হয়ে ঘরে বসে রইল, খুব খারাপ অবস্থায় হাস্পাতাল গিয়ে বললো রুনি নাকি তার ইন্সুলিন লুকিয়ে তাকে মারার ব্যবস্থা করেছে। রুনি পরকীয়া করছে, রুনি ঘরের টাকা সরিয়ে দেশে পাঠাচ্ছে, কত কি অভিযোগ।

তাহেরের সাথে আর ঘর করার সাহস হয় না রুনির। ভয় লাগে, মাঝেমধ্যেই সে দুঃস্বপ্ন দেখে তাহের তাকে মেরে ফেলছে, ফরহাদ কে মেরে রুনির নামে দোষ চাপিয়ে দিচ্ছে। পুলিশ কে বলে এখন সে শেল্টারে। ফুটন্ত কড়াই থেকে জলন্ত চুলায়। এক তাহেরের বদলে নিত্য নতুন উপদ্রব এসে হাজির হয়। ভিসা আছে আর দুই মাস, এরপর কি হবে কে জানে। সোশ্যাল ওয়ার্কার বলেছে, তারা দেখছে। কি দেখছে, তারাই জানে।

রুনিকে সবাই বলে দেশে যাও। রুনি চুপ করে থাকে। দেশে স্বামী পরিত্যক্তার অবস্থা সে জানে। তার নিজেরই ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর ননদ ডিভোর্সি, বান্ধবী

প্রায়ই বলে নিজের সংসার খেয়ে এখন আমার সংসার ভাংতে এসেছে। নাহ, সে দেশে যাবে না। সে এর শেষ দেখে ছাড়বে। দেখি, আল্লাহ আর কত পরীক্ষা বাকি রেখেছেন তার জন্য। নিজেকে মাঝেমধ্যে সে অবাক হয়ে দেখে, এত শক্তি সে পেল কই। ফেসবুকে তার বন্ধুবান্ধব কে দেখে, বাচ্চার জন্মদিনের পার্টি, বেবি শাওয়ার। সে গতকাল সকাল দুপুর না খেয়ে ছিল, না খাওয়ার মত কিছু ছিল না ছিল বাজার করার মত শক্তি। রাতে কোনরকমে দুধ রুটি কিনে দুজন খেয়েছে।

চোখ বন্ধ হয়ে আসে রুনির। হু, কয়েক ঘন্টার জন্য মুক্তি।

সমাপ্ত

নৈত্যপুরাণ

আমেনা বেগম ছোটন

ওয়েমার্ক ই-পাবলিকেশন

আমেনা বেগম ছোটন

ডাঃ আমেনা বেগম ছোটন। সিলেট মেডিকেল হতে এমবিবিএস শেষ করে বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী। নিজে লেখার চেয়ে অন্যদের লেখালেখি তে উৎসাহ দিতে বেশি ভালবাসেন।